অধ্যায় ৩

মানব শারীরতত্ত্ব : পরিপাক ও শোষণ
Human Physiology : Digestion & Absorption

মানবদেহের বিভিন্ন জৈবনিক কাজ পরিচালনা, শক্তি সরবরাহ, দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা এবং রোগজীবাণুর আক্রমণ থেকে দেহকে রক্ষা করার প্রাথমিক প্রয়োজনীয় শর্ত হচ্ছে **পুষ্টি** (nutrition)। **খাদ্য** (food)-ই মানবদেহে পুষ্টির যোগান দেয়। তবে মানুষ যেসব খাদ্য গ্রহণ করে থাকে তার অধিকাংশই দেহকোষের প্রোটোপ্লাজম শোষণ করতে পারেনা। শরীরের কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন এনজাইমের তৎপরতায় খাদ্য **পরিপাক** (digestion) নামে এক বিশেষ জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প হতে হয়। এ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রথমে সরল দ্রবণীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পরে প্রবেশের উপযোগী হয়। সবশেষে রক্ত এ পরিপাককৃত খাদ্যকে শরীরের বিভি সরবরাহ করে।

প্রধান শব্দাবলি (Key

- ☐ পরিপাক
- ☐ টায়
- ☐ পিত্তরস
- ☐ গ্যাস্ট্রি
- ☐ BMI
- ☐ স্থূলতা

পিরিয়ড সংখ্যা-১১ : এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা যা পারবে (শিখনফল)

শিখনফল	বিষয়বস্তু
১. মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাকের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ২. পাকস্থলির বিভিন্ন অংশে সংগঠিত যান্ত্রিক ও রাসায়নিক পরিপাকের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। ৩. যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. খাদ্যদ্রব্য পরিপাকে ক্ষুদ্রান্ত্রের বিভিন্ন অংশের মুখ্য ক্রিয়াসমূহ (major actions) বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. ক্ষুদ্রান্ত্রের লুমেন হতে রক্তনালিকা ও ভিলাই পর্যন্ত পরিপাককৃত দ্রব্যের শোষণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বৃহদন্ত্রের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. ব্যবহারিক : পরিপাক সংশ্লিষ্ট অঙ্গের কোষসমূহ শনাক্ত ও চিত্র অংকন করতে পারবে। ১০. স্থূলতার ধারণা, কারণ ও প্রতিরোধ ব্যাখ্যা করতে পারবে।	● মুখগহ্বরের খাদ্য পরিপাক- ○ যান্ত্রিক ○ রাসায়নিক ● পাকস্থলির বিভিন্ন অংশে সংগঠিত পরি ○ যান্ত্রিক ○ রাসায়নিক ● পরিপাক গ্রন্থির কাজ- ○ যকৃত ○ অগ্ন্যাশয় ● পরিপাকে স্নায়ু ও হরমোনের ভূমিক ● ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের-○ পরিপাক ○ শো ● বৃহদন্ত্রের কাজ ● **ব্যবহারিক** ○ যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়, পাক্ ক্ষুদ্রান্ত্রের অনুচ্ছেদ (section) এ স্লাইড পর্যবেক্ষণ ও শনাক্তকরণ। ● স্থূলতা-○ ধারণা ○ কারণ ○ প্রতি

পরিপাক (Digestion)

যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জটিল খাদ্যবস্তু বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে ও এনজাইমের সহায়তায় দ্রবণীয় সরল ও তরল এবং দেহকোষের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে তাকে পরিপাক (digestion) **বলে**। যে তন্ত্রের খাদ্যবস্তুর পরিপাক ও শোষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে **পৌষ্টিকতন্ত্র** বলে।

পরিপাক প্রক্রিয়া কতগুলো ধারাবাহিক **যান্ত্রিক** ও **রাসায়নিক** প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।

১. যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical digestion) : পরিপাকের সময় যে প্রক্রিয়ায় গৃহীত খাদ্যের পরিশোষ অংশ চিবানো, গলাধঃকরণ ও পৌষ্টিকনালি অতিক্রমের সময় নালির বিভিন্ন অংশের পেশল সঞ্চালনের ফলে ভাঙনের (physical breakdown) মাধ্যমে অতি ক্ষুদ্র টুকরায় পরিণত হয়ে এবং এনজাইমের ক্রিয়াতলের বৃদ্ধি (increases the surface area for the action of the digestive enzymes) সহজ ও সম্ভব করে তোলে যান্ত্রিক পরিপাক বলে।

২. রাসায়নিক পরিপাক (Chemical digestion) : পরিপাকের সময় গৃহীত খাদ্যের পরিপাকযোগ্য অংশ পরিপাকের পরপরই মুখ, পাকস্থলি ও অন্ত্রে এসিড, ক্ষার ও এনজাইমের সহায়তায় রাসায়নিক ভাঙনের (che breakdown) মাধ্যমে দেহকোষের গ্রহণোপযোগী উপাদানে পরিণত হওয়াকে রাসায়নিক পরিপাক বলে।

মানবদেহের পৌষ্টিকতন্ত্র **পৌষ্টিকনালি** এবং সংশ্লিষ্ট **পৌষ্টিকগ্রন্থি** নিয়ে গঠিত।

পৌষ্টিকতন্ত্র

পৌষ্টিকনালি

১. মুখছিদ্র
২. মুখগহ্বর
৩. গলবিল
৪. অন্ননালি
৫. পাকস্থলি
   ক. কার্ডিয়া
   খ. ফানডাস
   গ. বড় বাঁক
   ঘ. পাইলোরাস
   ঙ. ছোট বাঁক
৬. ক্ষুদ্রান্ত্র
   ক. ডিওডেনাম
   খ. জেজুনাম
   গ. ইলিয়াম
৭. বৃহদন্ত্র
   ক. সিকাম
   খ. কোলন
      i) উর্ধ্বমুখী
      ii) অনুপ্রস্থ
      iii) নিম্নমুখী
      iv) সিগময়েড
   গ. মলাশয়
৮. পায়ু

পৌষ্টিকগ্রন্থি

১. লালাগ্রন্থি
২. যকৃত
৩. অগ্ন্যাশয়
৪. গ্যাস্ট্রিকগ্রন্থি
৫. আন্ত্রিকগ্রন্থি

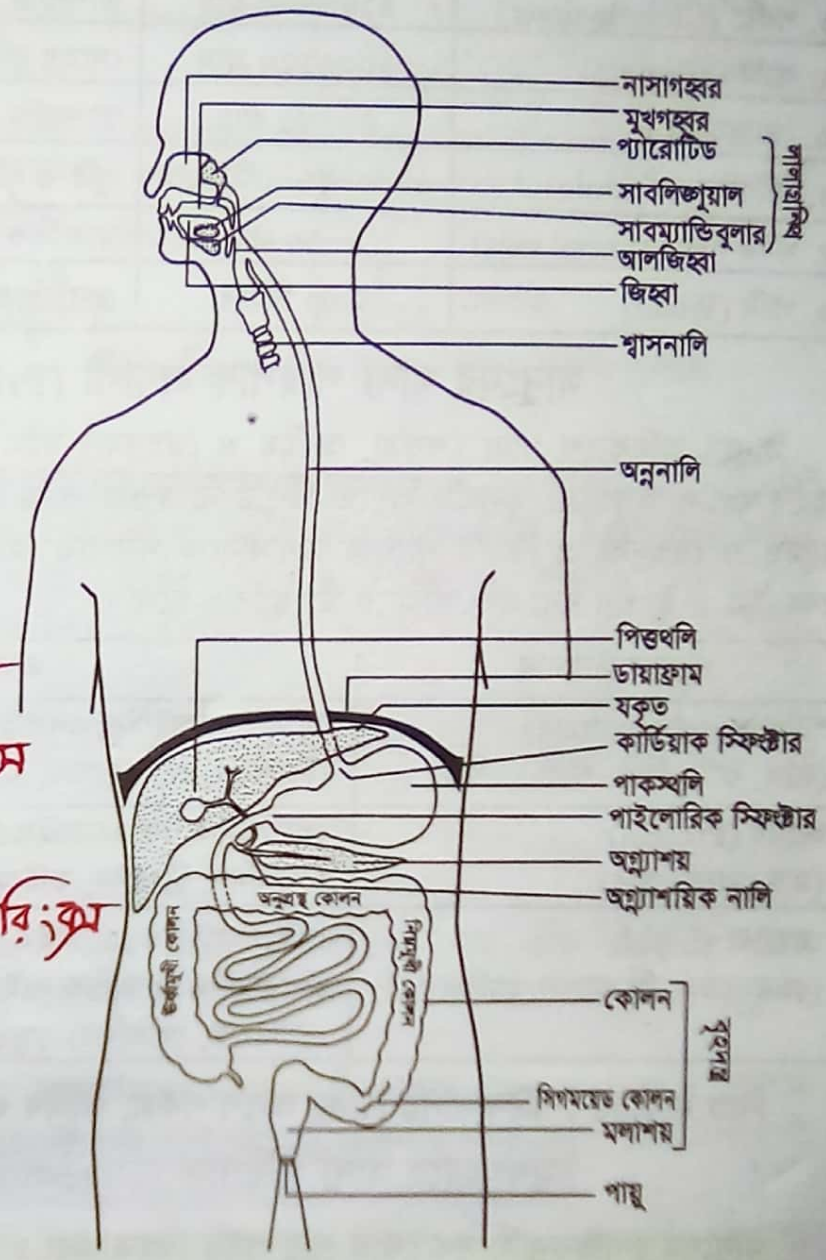

চিত্র ৩.১ : মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্র (সরলীকৃত)

মানুষের পৌষ্টিকনালিতে বিভিন্ন ধরনের জটিল খাদ্যের পরিপাক নিম্নোক্ত ৬টি ধাপে সম্পন্ন হয়।

১. খাদ্য ও পানি গলাধঃকরণ (Ingestion of food & water)
২. খাদ্যের যান্ত্রিক পরিপাক (Mechanical digestion of food)
৩. খাদ্যের রাসায়নিক পরিপাক (Chemical digestion of food)
৪. পৌষ্টিকনালিতে খাদ্যের সঞ্চালন (Movement of food along the alimentary canal)
৫. পরিপাককৃত খাদ্য ও পানি পরিশোষণ (Absorption of digested food & water)
৬. বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন (Elemination of undigested materialis)

মানুষ **সর্বভুক** (omnivorus) প্রাণী। উদ্ভিজ ও প্রাণিজ উভয় ধরনের খাদ্যই এরা গ্রহণ করে থাকে। এদের খাদ্য তালিকায় ছয়টি খাদ্য উপাদানই রয়েছে। তবে শর্করা, আমিষ ও স্নেহজাতীয় খাদ্য জটিল হওয়ার কারণে এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয়। বাকি তিনটি খাদ্যোপাদান, যেমন–ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি কোষে সরাসরি গৃহীত হওয়ায় এগুলো পরিপাকের প্রয়োজন হয় না। সঠিক পরিমাণ শর্করা, আমিষ, স্নেহদ্রব্য, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি নিয়ে গঠিত যে খাদ্য কোনো ব্যক্তির স্বাভাবিক পুষ্টি ও প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করে, তাকে **সুষম খাদ্য** (balance diet) বলে। নিচে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ মানুষের সুষম খাদ্যের তালিকা প্রদান করা হলো।

খাদ্য উপাদান	পরিমাণ	প্রধান কাজ
১. শর্করা (Carbohydrate)	৪১৫–৬০০ গ্রাম	তাপশক্তি উৎপাদন ও দেহে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি।
২. আমিষ (Protein)	১০০–১৫০ গ্রাম	দেহের বৃদ্ধি, কোষগঠন, ক্ষয়পূরণ, এনজাইম ও হরমোন উৎপা
৩. স্নেহদ্রব্য (Lipid)	৫০–৫৫ গ্রাম	তাপশক্তি উৎপাদন ও দেহের তাপ নিয়ন্ত্রণ।
৪. ভিটামিন (Vitamin)	৫৫০০–৫৬০০মিলিগ্রাম	পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করা এবং রোগ প্রতিরোধ শক্তি বাড়া
৫. খনিজ লবণ (Mineral salts)	৮–১০ গ্রাম	স্বাভাবিক পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা।
৬. পানি (Water)	২–৩ লিটার	প্রোটোপ্লাজমকে সিক্ত ও সজীব রাখা এবং কোষের বিপাক ক্রিয়া নি

মানুষের খাদ্য পরিপাক প্রণালী (Process of Human Digestion)

মানুষে অধিকাংশ খাদ্য (শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্য) বৃহৎ অণু হিসেবে মুখগহ্বরে গৃহীত হয়। খাদ্যবস্তুর বৃহত্তর জটিল অণুগুলো ক্ষুদ্রতম অণুতে বিশ্লিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত মানব দেহের কোন কাজে আসে না। সেজন্য শ আমিষ ও স্নেহদ্রব্য এ তিনটি খাদ্যের উপাদানকে পরিপাক করতে হয়। নিচে খাদ্য উপাদানের নাম, পরিপাক এনজাইম ও উৎপন্ন দ্রব্য ছক আকারে উপস্থাপিত হলো।

খাদ্যের উপাদান	প্রধান এনজাইম	উৎপন্ন দ্র
শর্করা (Carbohydrate) (ভাত, রুটি, চিনি, শাক-সবজি)	অ্যামাইলোলাইটিক এনজাইম (Amylolytic enzyme) (টায়ালিন, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, সুক্রেজ)	গ্লুকোজ
আমিষ (Protein) (মাছ, মাংস, ডাল)	প্রোটিওলাইটিক এনজাইম (Proteolytic emzyme) (পেপসিন, ট্রিপসিন, কাইমোট্রিপসিন, অ্যামিনোট্রিপসিন)	অ্যামিনো এ
স্নেহদ্রব্য (Lipid) (ভোজ্যতেল, ঘি, মাখন, প্রাণিজ চর্বি)	লাইপোলাইটিক এনজাইম (Lypolytic enzyme) (পাকস্থলীয় ও আন্ত্রিক লাইপেজ, ফসফোলাইপেজ, কোলেস্টেরল এস্টারেজ, লেসিথিন)	ফ্যাটি এসি ও গ্লিসার

নিচে মানুষের পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে শর্করা, আমিষ ও স্নেহদ্রব্যের পরিপাক সম্পর্কে আলোচনা করা হ

মুখগহ্বরে খাদ্য পরিপাক (Digestion of Food in Buccal Cavity)

মানুষের পৌষ্টিকনালি মুখ থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ৮–১০ মিটার লম্বা। পৌষ্টিকনালির শুরু মুখ থেকে। নাসাছিদ্রের নিচে অবস্থিত এক আড়াআড়ি ছিদ্র যা একটি করে উপরের ও নিচের ঠোঁটে বেষ্টিত থাকে। মুখছিদ্রের মা খাদ্যবস্তু মুখগহ্বর বা মুখবিবরে প্রবেশ করে।

মুখপরবর্তী গহ্বরটি মুখগহ্বর। একে ঘিরে এবং এর ভিতরে কয়েকটি অঙ্গ অবস্থিত। এসব অঙ্গের মধ্যে গাল, মাড়ি, জিহ্বা ও তালু প্রধান।

মুখগহ্বরের উর্ধ্ব প্রাচীর তালুর অস্থি ও পেশি দিয়ে, সামনের প্রাচীর ঠোঁটের পেশি দিয়ে এবং পাশের প্রাচীর গালের পেশি নিয়ে গঠিত। তালুর অগ্রভাগ অস্থিনির্মিত ও শক্ত, পশ্চাৎভাগ পেশল ও নরম। কোমল তালুর পেছনের প্রান্তের মধ্যভাগ থেকে একটি পেশল **আলজিহ্বা** (epiglottis) মুখগহ্বরে ঝুলে থাকে।

নিম্ন চোয়ালের অস্থির সাথে জিহ্বা যুক্ত থাকে। এর পৃষ্ঠতলে থাকে ফ্লাস্ক আকৃতির **স্বাদকুঁড়ি** (taste buds)। স্বাদকুঁড়িগুলো খাদ্যে অবস্থিত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক বস্তুর প্রতি সংবেদনশীল। যেমন-জিহ্বার অগ্রপ্রান্তে মিষ্টি, অগ্রভাগের দুপাশে নোনা, পশ্চাৎভাগের দুপাশে টক (অম্লতা) এবং পেছন দিকে তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করে। পাঁচ-দশ দিনের মধ্যে খাদ্যের ঘসায় স্বাদকুঁড়ি নষ্ট বা ছিন্ন হয়ে যায় এবং প্রতিস্থাপিত হয়।

চিত্র ৩.২ : বিভিন্ন স্বাদকুঁড়ি

মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে তিনজোড়া **লালাগ্রন্থি** salivary gland) অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে দুপাশের কানের নিচে **প্যারোটিড গ্রন্থি** (parotid gland), নিচের চোয়ালের ভিতর দিকে **সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি** (submandibular gland) এবং জিহ্বার তলায় **সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি** (sublingual gland)। গ্রন্থিগুলো রস ক্ষরণকারী এবং এপিথেলিয়ামে আবৃত গোল বা ডিম্বাকার থলি (sac) বিশেষ। থলির প্রাচীরে যে সেরাস কোষ ও মিউকাস কোষ রয়েছে তা থেকে রস ক্ষরিত হয়। লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত **লালা** (saliva) কিছুটা অম্লীয় এবং এর অধিকাংশই পানি (৯৫.৫%)। একজন সুস্থ মানুষ প্রতিদিন ১২০০–১৫০০ মিলিলিটার লালা ক্ষরণ করে।

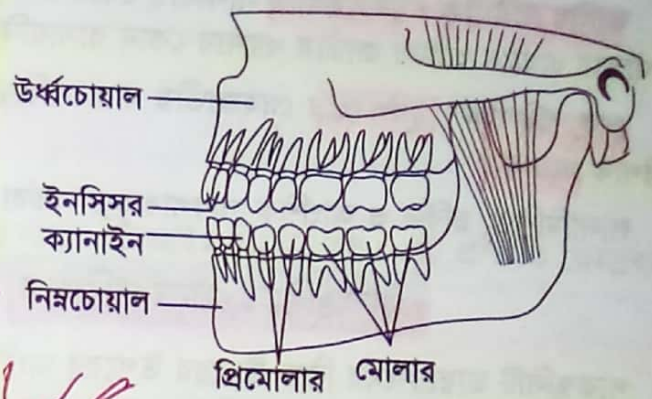

চিত্র ৩.৩ : মানুষের চোয়ালে দাঁতের বিন্যাস

দন্ত সংকেত (Dental formula) : স্তন্যপায়ী প্রাণিদের মোট দাঁতের সংখ্যা যে সংকেতের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে **দন্ত সংকেত** বা **ডেন্টাল ফর্মুলা** বলে। মানুষের চোয়ালে চার ধরনের দাঁত থাকে। একটি সরল রেখার উপর ও নিচে বিভিন্ন প্রকার দাঁতের ইংরেজি নামের প্রথম অক্ষর লিখে ঐ ধরনের দাঁত প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশে কয়টি আছে তা লেখা হয়। এরপর প্রতি চোয়ালের অর্ধাংশের মোট দাঁতের সংখ্যাকে ২ দিয়ে গুণ করে উভয় চোয়ালের দাঁতের সংখ্যা যোগ করলে মোট দাঁতের সংখ্যা পাওয়া যায়। এ নিয়ম অনুযায়ী মানুষের দন্ত সংকেত হচ্ছে:

$$\frac{I_2C_1P_2M_3}{I_2C_1P_2M_3} = \frac{8 \times 2}{8 \times 2} = ১৬ + ১৬ = ৩২$$

মুখগহ্বরে খাদ্যবস্তু দুভাবে পরিপাক হয় যান্ত্রিক (mechanical) **ও রাসায়নিক** (chemical)।

যান্ত্রিক পরিপাক

- সামান্যতম স্বাদ, গন্ধ ও খাদ্য গ্রহণে স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্ক যে সংকেত পায় তার প্রেক্ষিতে মস্তিষ্ক লালাগ্রন্থিগুলোতে **লালা** ক্ষরণের বার্তা পাঠায়। লালা মূলত পানিতে গঠিত এবং খাদ্যকে এমনভাবে নরম ও মসৃণ করে যাতে দাঁতের কাজ দ্রুত ও সহজ হয়।
- চার ধরনের দাঁত যেমন– **ইনসিসর** (Incisor), **ক্যানাইন** (Canine), **প্রিমোলার** (Pre-molar) ও **মোলার** (Molar)-এর নানা ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে বড় খাদ্যখণ্ড কাটা-ছেঁড়া, পেষণ-নিষ্পেষণ শেষে হজম উপযোগী ছোট ছোট টুকরায় পরিণত হয়।
- জিহ্বা নড়া-চড়া ও সংকোচন-প্রসারণক্ষম পেশল অংশ। এটি স্বাদ নেওয়া ছাড়াও দাঁতে আটকে থাকা খাদ্যকণা সরাতে, মুখের চারপাশে ঘুরিয়ে বিভিন্ন দাঁতের নিচে পৌঁছাতে, লালা মিশ্রণে এবং সবশেষে গিলতে সাহায্য করে।
- যান্ত্রিক পরিপাকের সময় খাদ্যখণ্ড নিষ্পেষিত হয়ে নরম **খাদ্যমণ্ড** (bolus)-তে পরিণত হয়। জিহ্বার উপরতল যখন খাদ্যমণ্ডকে **শক্ত তালুর** (hard palate) বিপরীতে রেখে চাপ দেয় তখন খাদ্যমণ্ড পেছন দিকে যেতে বাধ্য হয়।
- পেছনে **কোমল তালু** (soft palate) থাকায় খাদ্যপিণ্ড নাসাছিদ্রপথে প্রবেশে বাঁধা পায়।
- কোমল তালু পার হলেই খাবার গলবিলে এসে পৌঁছায়। গলবিল থেকে দুটি নালি চলে গেছে– একটি **শ্বাসনালি** (trachea), অন্যটি **অন্ননালি** (oesophagus)।
- জিহ্বার গোড়ার দিকে শ্বাসনালির অংশে ছোট উদগত অংশ হিসেবে অবস্থিত **আলজিহ্বা** (epiglottis) অন্ননালির উপর এমন এক উর্ধ্বগামী বলপ্রয়োগ করে যাতে চিবানো খাদ্য শ্বাসনালির ভিতর প্রবেশ না করে অন্ননালির ভিতর প্রবেশ করে।

রাসায়নিক পরিপাক

শর্করা পরিপাক : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে **টায়ালিন** ও **মল্টেজ** (অল্প) নামে শর্করাবিশ্লেষী এনজাইম পাওয়া যায়। এগুলো জটিল শর্করাকে মল্টোজ এবং সামান্য মল্টোজকে গ্লুকোজে পরিণত করে। টায়ালিনের ক্রিয়া মুখগহ্বরে শুরু হলেও এর পরিপাক ক্রিয়া সংঘটিত হয় পাকস্থলিতে।

১. জটিল শর্করা $\xrightarrow{\text{টায়ালিন}}$ মল্টোজ। ২. মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ

আমিষ পরিপাক : মুখগহ্বরের লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত লালারসে কোন প্রোটিওলাইটিক (আমিষ বিশ্লেষী) এনজাইম না থাকায় এখানে আমিষ জাতীয় খাদ্যের কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেনা।

স্নেহ পরিপাক : মুখগহ্বরে স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাকের জন্য কোন এনজাইম না থাকায় এধরনের খাদ্যের পরিপাক ঘটেনা।

লালামিশ্রিত, চর্বিত ও আংশিক পরিপাককৃত শর্করা গলবিল ও অন্ননালির মাধ্যমে পাকস্থলিতে পৌঁছায়।

পাকস্থলিতে খাদ্য পরিপাক (Digestion of Food in Stomach)

পাকস্থলিটি ডায়াফ্রামের নিচে উদরের উপরের অংশে অবস্থিত প্রায় ২৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ১৫ সেন্টিমিটার বাঁকানো থলির মতো অংশ। একে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়, যথা ঃ

i. যে অংশে অন্ননালি উন্মুক্ত হয় তা **কার্ডিয়া** (cardia)।

ii. কার্ডিয়ার বাম পাশে পাকস্থলি-প্রাচীর যা গম্বুজাকার ধারণ করে তা **ফানডাস** (fundus)।

iii. ডান অবতল ও বাম উত্তল কিনারা যথাক্রমে **ছোট** ও **বড় বাঁক** (lesser and greater curvatures)।

iv. যে অংশটি ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়েছে তা **পাইলোরাস** (pylorus) নামে পরিচিত।

চিত্র ৩.৪ : পাকস্থলির বিভিন্ন অংশ

কার্ডিয়াক ও পাইলোরিক অংশে একটি করে বৃত্তাকার পেশিবলয় আছে। বলয়দুটিকে যথাক্রমে **কার্ডিয়াক স্ফিংটার** ও **পাইলোরিক স্ফিংটার** বলে।

যান্ত্রিক পরিপাক

- মুখ থেকে চর্বিত খাদ্য অন্ননালিপথে পাকস্থলিতে এসে ২-৬ ঘন্টাকাল অবস্থান করে।
- এসময় **প্যারাইটাল কোষ** থেকে HCl ক্ষরিত হয়ে খাদ্য বাহিত অধিকাংশ ব্যাকটেরিয়াকে ধ্বংস করে।
- মসৃণ পেশির ৩টি স্তর নিয়ে পাকস্থলি গঠিত। পেশিস্তর বিভিন্ন দিকমুখি হওয়ায় পাকস্থলি প্রাচীর নানা সঞ্চালিত হয়ে (মোচড় দিয়ে, সংকুচিত হয়ে কিংবা চাপা হয়ে) মুখগহ্বর থেকে আসা অর্ধচূর্ণ খাদ্যকে **পেস্ট** (paste)-এ পরিণত করে।
- এসময় **গ্যাস্ট্রিক জুস** (gastric juice) ক্ষরিত হয়ে পাকস্থলির যান্ত্রিক চাপে পিষ্ট খাদ্যের সঙ্গে মিশে ঘন মতো মিশ্রণে পরিণত হয়। খাদ্যের এ অবস্থা **কাইম** (chyme) বা **মন্ড** নামে পরিচিত। এর উপর গ্যা গ্রন্থি নিঃসৃত বিভিন্ন এনজাইমের পরিপাক কাজ শুরু হয়ে যায়।

রাসায়নিক পরিপাক

পাকস্থলির প্রাচীর পেশিবহুল এবং **গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি** (gastric gland) সমৃদ্ধ। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এক ধরনের নলাকার এবং চার ধরনের কোষে গঠিত। প্রত্যেক ধরনের কোষের ক্ষরণ আলাদা। সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির ক্ষ "গ্যাস্ট্রিক জুস" বলে। এর ৯৯.৪৫%ই পানি। **গ্যাস্ট্রিন** (gastrin) নামক হরমোন এই জুস ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে।

শর্করা পরিপাক : পাকস্থলি থেকে শর্করাবিশ্লেষী কোন এনজাইম নিঃসৃত হয় না। ফলে শর্করা জাতীয় খাদ্যের পরিবর্তন ঘটে না।

আমিষ পরিপাক : গ্যাস্ট্রিক জুসে **পেপসিনোজেন** ও **প্রোরেনিন** নামক নিষ্ক্রিয় প্রোটিওলাইটিক (আমিষ বি এনজাইম থাকে। এ দুটি নিষ্ক্রিয় এনজাইম গ্যাস্ট্রিক জুসের HCl-এর সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে **পেপসিন** ও নামক সক্রিয় এনজাইমে, পরিণত হয়। পেপসিন অম্লীয় মাধ্যমে জটিল আমিষের আর্দ্র বিশ্লেষণ ঘটিয়ে প্রোটি পেপটোন-এ পরিণত করে। রেনিন দুগ্ধ আমিষ কেসিনকে প্যারাকেসিনে পরিণত করে।

১. আমিষ + পানি $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ প্রোটিওজ + পেপটোন

২. কেসিন (দুগ্ধ আমিষ)+ পানি $\xrightarrow{\text{রেনিন}}$ প্যারাকেসিন

৩. প্যারাকেসিন $\xrightarrow{\text{পেপসিন}}$ পেপটোন

স্নেহ পরিপাক : পাকস্থলির প্রাচীর থেকে **গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ** নামক এনজাইম নিঃসৃত হয়। এটি প্রশমিত স্নেহদ্রব্যকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল-এ পরিণত করে।

স্নেহদ্রব্য $\xrightarrow{\text{গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল

অর্ধপাচিত এ খাদ্য ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। পাকস্থলির পাইলোরিক প্রান্তে অবস্থিত **স্ফিংক্টার** (sphincter পেশির বেড়ী যা ছিদ্রপথকে বেষ্টন করে থাকে) পাকস্থলি থেকে ডিওডেনামে খাদ্যের প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।

পাকস্থলির প্রাচীর নিজেই এনজাইম দ্বারা পরিপাক হয়ে যায় না কেন ? কারণ–

১. এনজাইমগুলো নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ক্ষরিত হয়।

২. পাকস্থলি প্রাচীরের কোষ মিউকাস উৎপাদন করে এবং গাত্র মিউকাসের আবরণে আবৃত থাকে।

৩. কোষের এন্টিএনজাইম পাকস্থলির প্রাচীরস্থ কোষের উপর ক্রিয়া করতে দেয় না।

ক্ষুদ্রান্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের পরিপাক (Digestion of Food in Small Intestine)

পাকস্থলির পাইলোরিক স্ফিংক্টারের পর থেকে বৃহদন্ত্রের সূচনায় ইলিওকোলিক স্ফিংক্টার (iliocolic sphincter) পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৬-৭ মিটার লম্বা, পাঁচানো অংশকে ক্ষুদ্রান্ত্র বলে। ক্ষুদ্রান্ত্র তিনটি অংশে বিভক্ত, যথা **ডিওডেনাম** (duodenum), **জেজুনাম** (jejunum) এবং **ইলিয়াম** (ileum)। ডিওডেনাম হচ্ছে ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ যা দেখতে "U"- আকৃতির ও ২৫-৩০ সেন্টিমিটার লম্বা। জেজুনাম মধ্যাংশ, লম্বায় আড়াই মিটার। শেষ অংশটি ইলিয়াম যা ক্ষুদ্রান্ত্রের তিন-পঞ্চমাংশ গঠন করে।

সব ধরনের খাদ্যের চূড়ান্ত পরিপাক ক্ষুদ্রান্ত্রেই সংঘটিত হয়। খাদ্যের উপর তিন ধরনের রস, যেমন-**পিত্তরস** (bile), **অগ্ন্যাশয় রস** (pancreatic juice) ও **আন্ত্রিক রস** (intestinal juice) ক্রিয়া করে।

যান্ত্রিক পরিপাক

- আন্ত্রিক রসের মিউসিনের ক্রিয়ায় ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্যস্থিত খাদ্যবস্তু পিচ্ছিল হয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়।
- ব্রুনার্স গ্রন্থি ও গবলেট কোষ থেকে মিউকাস তৈরি হয়। মিউকাস ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীরকে এনজাইমের কার্যকারিতা থেকে রক্ষা করে।
- পিত্তরস পরোক্ষভাবে অন্ত্রে জীবাণুর কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়।
- পিত্তলবণগুলো ক্ষুদ্রান্ত্রের পেশির ক্রমসংকোচন বাড়িয়ে বৃহদন্ত্রের দিকে খাদ্যের গতি বৃদ্ধি করে।
- কোলিসিস্টোকাইনিন নামক হরমোন পিত্তাশয়ের সংকোচন ঘটিয়ে পিত্তাশয়ে সঞ্চিত পিত্তরস ক্ষুদ্রান্ত্রে পৌঁছে দেয়।
- পিত্তলবণ স্নেহদ্রব্যকে অবদ্রবণের মাধ্যমে (emulsification) সাবানের ফেনার মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে।

রাসায়নিক পরিপাক

পাকস্থলি থেকে আগত অম্লীয় কাইম (chyme) অর্ধ-পরিপাককৃত শর্করা ও আমিষ এবং প্রায় অপরিপাককৃত স্নেহদ্রব্য নিয়ে গঠিত। কাইম ক্ষুদ্রান্ত্রের গহ্বরে পৌঁছালে অন্ত্রের প্রাচীর থেকে এন্টেরোকাইনিন (enterokinin), সেক্রেটিন (secretin) এবং কোলেসিস্টোকাইনিন (cholecystikinin) নামক হরমোন ক্ষরিত হয়। এসব হরমোনের প্রভাবে পিত্তথলি, অগ্ন্যাশয় ও আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে যথাক্রমে পিত্তরস, অগ্ন্যাশয় রস ও আন্ত্রিক রস নিঃসৃত হয়।

পিত্তরস ক্ষার জাতীয় তরল পদার্থ। এতে কোন এনজাইম থাকে না। পিত্তরসের সোডিয়াম বাইকার্বোনেট উপাদানটি পাকস্থলি থেকে আগত HCl–কে প্রশমিত করে অন্ত্রের অভ্যন্তরে একটি ক্ষারীয় মাধ্যম তৈরি করে যা ক্ষুদ্রান্ত্রে বিভিন্ন এনজাইমের কার্যকারিতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

শর্করা পরিপাক

অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত রসে শর্করা পরিপাকের জন্য নিচে বর্ণিত এনজাইম ক্রিয়া করে।

১. **অ্যামাইলেজ** এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় জটিল শর্করাকে মল্টোজে পরিণত করে।

স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ।

২. **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজ জাতীয় শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

মল্টোজ $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ গ্লুকোজ।

আন্ত্রিক রসে শর্করা জাতীয় খাদ্য পরিপাককারী নিম্নলিখিত এনজাইম ক্রিয়া করে :

১. আন্ত্রিক **অ্যামাইলেজ** স্টার্চ, ডেক্সট্রিন প্রভৃতি পলিস্যাকারাইডকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ ও ডেক্সট্রিন উৎপন্ন করে।

স্টার্চ, ডেক্সট্রিন + H_2O $\xrightarrow{\text{অ্যামাইলেজ}}$ মল্টোজ, মল্টোট্রায়োজ, ক্ষুদ্র ডেক্সট্রিন।

২. **আইসোমল্টেজ** এনজাইম আইসোমল্টোজ জাতীয় শর্করাকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মল্টোজ ও গ্লুকোজ উৎপন্ন

আইসোমল্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{আইসোমল্টেজ}}$ মল্টোজ + গ্লুকোজ।

৩. **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজকে বিশ্লিষ্ট করে গ্লুকোজ তৈরি করে।

মল্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{মল্টেজ}}$ মল্টোজ + গ্লুকোজ।

৪. **সুক্রেজ** এনজাইম সুক্রোজ নামক ডাইস্যাকারাইডকে ভেঙ্গে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু ফ্রুক্টোজ সৃষ্টি ক

সুক্রোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{সুক্রেজ}}$ গ্লুকোজ + ফ্রুক্টোজ।

৫. **ল্যাক্টেজ** এনজাইম দুধের ল্যাক্টোজ নামক ডাই-স্যাকারাইডকে ভেঙ্গে এক অণু গ্লুকোজ ও এক অণু গ্যাল পরিণত করে।

ল্যাক্টোজ + H_2O $\xrightarrow{\text{ল্যাক্টেজ}}$ গ্লুকোজ + গ্যালাক্টোজ। শিশুদের বিকাশে সহায়তা করে।

আমিষ পরিপাক

অগ্ন্যাশয় রসে অবস্থিত এনজাইমসমূহ আমিষ জাতীয় খাদ্যের উপর নিম্নরূপ ক্রিয়া করে।

১. **ট্রিপসিন** এনজাইম নিষ্ক্রিয় ট্রিপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। ডিওডেনামের মিউকোসা নিঃসৃত এন্টেরোক এনজাইমের সহায়তায় এটি সক্রিয় ট্রিপসিনে পরিণত হয়। ট্রিপসিন প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।

প্রোটিওজ ও পেপটোন $\xrightarrow{\text{ট্রিপসিন}}$ পলিপেপটাইড।

২. **কাইমোট্রিপসিন** নিষ্ক্রিয় কাইমোট্রিপসিনোজেনরূপে ক্ষরিত হয়। পরে ট্রিপসিনের ক্রিয়ায় এটি কাইমোট্রিপসিনে পরিণত হয়। এটি প্রোটিওজ ও পেপটোনকে ভেঙ্গে পলিপেপটাইডে পরিণত হয়।

প্রোটিওজ ও পেপটোন $\xrightarrow{\text{কাইমোট্রিপসিন}}$ পলিপেপটাইড।

৩. **কার্বোক্সিপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে সরল পেপটাইড (ডাইপেপটাই অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{কার্বোক্সিপেপটাইডেজ}}$ ডাইপেপটাইড + অ্যামিনো এসিড।

৪. **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙ্গে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৫. **ট্রাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

ট্রাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ট্রাইপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৬. **ডাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ডাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিড পরিণত করে।

ডাইপেপটাইড $\xrightarrow{\text{ডাইপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

৭. **কোলাজিনেজ** এনজাইম মাছ ও মাংসে বিদ্যমান কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে রূপান্তরিত করে।

কোলাজেন $\xrightarrow{\text{কোলাজিনেজ}}$ সরল পেপটাইড।

৮. **ইলাস্টেজ** এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙ্গে পেপটাইড উৎপন্ন করে।

ইলাস্টিন $\xrightarrow{\text{ইলাস্টেজ}}$ পেপটাইড।

আন্ত্রিক রসে আমিষ পরিপাককারী এনজাইম অ্যামিনোপেপটাইডেজ পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পলিপেপটাইড $\xrightarrow{\text{অ্যামিনোপেপটাইডেজ}}$ অ্যামিনো এসিড।

স্নেহ পরিপাক

স্নেহ পরিপাকে **পিত্তরস** গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পিত্তরসে কোন এনজাইম থাকে না। পিত্তরসে বিদ্যমান **পিত্তলবণ** (bile salts) সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট (sodium glycocholate) ও সোডিয়াম টরোকোলেট (sodium taurocholate) স্নেহ জাতীয় খাদ্যকে ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। এ প্রক্রিয়াকে **অবদ্রবণ** বা **ইমালসিফিকেশন** (emulsification) বলে।

অগ্ন্যাশয় রসে স্নেহজাতীয় খাদ্য বা ফ্যাট পরিপাককারী এনজাইম স্নেহকণাকে নিম্নরূপে পরিপাক করে–

১. **লাইপেজ** নামের এনজাইম স্নেহকণাকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

স্নেহকণা $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল।

২. **ফসফোলাইপেজ** এনজাইম ফসফোলিপিডের উপর নিম্নরূপ ক্রিয়া করে–

ফসফোলিপিড $\xrightarrow{\text{ফসফোলাইপেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল + ফসফোরিক এসিড।

৩. **কোলেস্টেরল এস্টারেজ** এনজাইম কোলেস্টেরল এস্টারের উপর ক্রিয়া করে ফ্যাটি এসিড ও কোলেস্টেরল উৎপন্ন করে।

কোলেস্টেরল এস্টার $\xrightarrow{\text{কোলেস্টেরল এস্টারেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + কোলেস্টেরল।

আন্ত্রিক রসে নিম্নলিখিত স্নেহ পরিপাককারী এনজাইম ক্রিয়া করে :

১. **লাইপেজ** এনজাইম পিত্তলবণের প্রভাবে স্নেহকণায় পরিণত হওয়া লিপিডকে আর্দ্রবিশ্লিষ্ট করে মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড উৎপন্ন করে। পরবর্তীতে তা ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে রূপান্তরিত হয়।

স্নেহকণা $\xrightarrow{\text{লাইপেজ}}$ মনোগ্লিসারাইড + ফ্যাটি এসিড।

২. **লেসিথিনেজ** এনজাইম লেসিথিনকে ফ্যাটি এসিড, গ্লিসারল, ফসফরিক এসিড ও কোলিনে পরিণত করে।

লেসিথিন $\xrightarrow{\text{লেসিথিনেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল + ফসফোরিক এসিড + কোলিন।

৩. **মনোগ্লিসারাইডেজ** কোষের ভেতরে মনোগ্লিসারাইডকে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে।

মনোগ্লিসারাইড $\xrightarrow{\text{মনোগ্লিসারাইডেজ}}$ ফ্যাটি এসিড + গ্লিসারল।

এছাড়াও আন্ত্রিক গ্রন্থির নিউক্লিয়েডেজ, নিউক্লিওটাইডেজ ও নিউক্লিওসাইডেজ এনজাইমসমূহ নিউক্লিক এসিড ও এর উপাদানসমূহে ফসফেট গ্রুপ, পেন্টোজ শুগার ও নাইট্রোজেন বেস-এ ভেঙ্গে দেয়।

পরিপাক গ্রন্থির ভূমিকা (Role of Digestive Glands)

পৌষ্টিকতন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব গ্রন্থি থেকে বিভিন্ন রস নিঃসৃত হয়ে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে তাদের **পৌষ্টিকগ্রন্থি** বা **পরিপাক গ্রন্থি** বলে। মানবদেহে পাঁচ ধরনের পৌষ্টিকগ্রন্থি বিদ্যমান, যথা- লালাগ্রন্থি, যকৃত, অগ্ন্যাশয়, গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি ও আন্ত্রিক গ্রন্থি। এসব গ্রন্থির মধ্যে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি পাকস্থলির প্রাচীরে এবং আন্ত্রিক গ্রন্থি অন্ত্রের প্রাচীরে

অবস্থান করে। অন্য গ্রন্থিগুলো পৌষ্টিকনালির বাইরে অবস্থিত এবং স্বতন্ত্র গঠন বিশিষ্ট। নিম্নে বিভিন্ন পৌষ্টিকগ্রন্থি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো :

১. লালাগ্রন্থি (Salivary glands)

মানুষের মুখগহ্বরের দুপাশে নিচে বর্ণিত তিনজোড়া লালাগ্রন্থি অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে –

১. প্যারোটিড গ্রন্থি (Parotid gland) : এগুলো সবচেয়ে বড় লালাগ্রন্থি। প্রতি কানের নিচে রয়েছে একটি করে মোট দুটি প্যারোটিড গ্রন্থি। প্রতিটি গ্রন্থি থেকে একটি নালি বের হয়ে দ্বিতীয় উর্ধ্বমোলার দাঁতের বিপরীতে মুখগহ্বরে উন্মুক্ত হয়।

২. সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি (Submandibular gland) : প্রতি ম্যান্ডিবল বা নিম্ন চোয়ালের কৌণিক অঞ্চলের নিচে একটি করে মোট একজোড়া সাবম্যান্ডিবুলার গ্রন্থি বিদ্যমান। এ গ্রন্থির নালি জিহ্বার ফ্রেনুলামের পাশে উন্মুক্ত হয়।

৩. সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি (Sublingual gland) : জিহ্বার নিচে অবস্থান করে একজোড়া সাবলিঙ্গুয়াল গ্রন্থি। এদের নালি জিহ্বার নিচে ফ্রেনুলাম নামক বিশেষ ত্বকের পাশে উন্মুক্ত হয়।

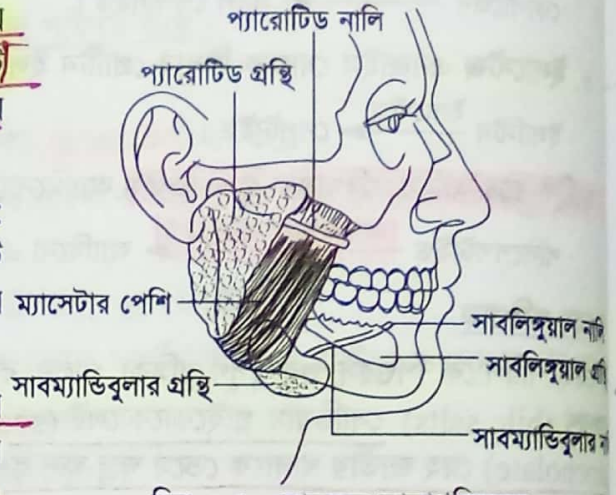

চিত্র ৩.৫ : মানুষের লালাগ্রন্থিসমূহ

লালা (Saliva) : লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত রসকে **লালা** বা **লালারস** বলে। একজন সুস্থ মানুষ দৈনিক 1200 - 1500 মিলি লালা নিঃসরণ করে। লালা ঈষৎ অম্লীয়, ফলে মুখগহ্বর সবসময় p^H 6.2–7.4 মাত্রায় আম্লিক অবস্থা বিরাজ করে।

লালার উপাদান (Composition of saliva) : লালার উপাদানগুলোর মধ্যে পানি, স্যালিভারি অ্যামাইলেজ, টায়ালিন ও মিউসিন নামক প্রোটিন এবং আরো কয়েকটি পদার্থ যথা– Na, K, বাইকার্বনেট, ক্লোরাইড ও ফসফেট থাকে। এছাড়া লালায় **লাইসোজাইম** নামক একটি এনজাইম, ইম্যুনোগ্লোবুলিন (immunoglobulin) A, এবং ইউরিয়া ও ইউরিক এসিড পাওয়া যায়। লালাগ্রন্থির ক্ষরণ শতকরা ৯৯.৫০ ভাগ পানি এবং .৫০ ভাগ ইলেকট্রোলাইট ও প্রোটিন ধারণ করে।

লালার কাজ (Functions of saliva)

i. লালার প্রায় ৯৯.৫% পানি। খাদ্যের স্বাদ অনুভব এবং পরিপাকের সময় বিক্রিয়া ঘটানোর জন্য পানি খাদ্যের দ্রাবক হিসেবে খাদ্যকে সিক্ত ও নরম করে। পানি মুখ অভ্যন্তরকেও আর্দ্র করে, ফলে স্বাদ অনুভবসহ খাদ্য চর্বণে এবং গলাধঃকরণে সুবিধা হয়। জিহ্বার স্বাদকুঁড়িগুলো শুকনো খাদ্যে প্রভাবিত হয় না। লালায় সিক্ত হয়ে খাদ্যকণা মুক্ত হয়ে তা থেকে স্বাদকুঁড়িগুলো অনুভূতি গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্যের স্বাদ বুঝা সম্ভব হয়।

ii. মুখ, জিহ্বা এবং ঠোঁট লালা দ্বারা সিক্ত থাকার কারণে কথা বলা সহজ হয়। ভয়, উত্তেজনা ইত্যাদি সময়ে কিংবা অসুস্থতার সময় লালা ক্ষরণ কমে যায়। ফলে কথা বলা অসুবিধা হয়।

iii. মিউসিন নামক প্রোটিন খাদ্যকে লুব্রিকেট করে দলায় পরিণত করে। লালা খাদ্য চর্বণ এবং গলাধঃকরণে সহায়ক। এসিড ও বেসকে প্রশমন (বাফার) করতেও এটি সাহায্য করে।

iv. **ক্লোরাইড** (Chloride) : স্যালিভারি অ্যামাইলেজকে সক্রিয় করে।

v. **স্যালিভারি অ্যামাইলেজ বা টায়ালিন এনজাইম** (Salivary amylase or Ptyaline) : রান্না করা স্টার্চ পলিস্যাকারাইডকে ভেঙ্গে মলটোজ এবং ডেক্সট্রিন নামক ডাইস্যাকারাইডে পরিণত করে।

vi. **বাইকার্বনেট** (Bicarbonate) : লালার আম্লিক p^H6.2 – 7.4 এর মধ্যে বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটি বাফার (buffer) হিসেবে কাজ করে। ফলে মুখে সৃষ্ট এসিডের শক্তি কমিয়ে রাখার মাধ্যমে দাঁতের এনামেল ক্ষয় রোধ করে।

vii. **লাইসোজাইম এনজাইম** (Lysozyme enzyme) : ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের মাধ্যমে দাঁতকে রক্ষা করে।

viii. **ইম্যুনোগ্লোবুলিন** (Immunoglobulin) স্যালিভারি এন্টিব্যাকটেরিয়াল সিস্টেমের অংশ।

ix. লালা সামগ্রিকভাবে মুখ অভ্যন্তর এবং দাঁত থেকে কোষীয় ও খাদ্যের ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করে, এবং মুখের নরম অংশের সংবেদনশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

২. যকৃত (Liver)

অবস্থান : যকৃত উদর-গহ্বরের উপরভাগে ডানদিকে ডায়াফ্রামের ঠিক নিচে ডিওডেনাম ও ডান বৃক্কের উপরদিকে পাকস্থলির ডান পাশে অবস্থিত।

গঠন : যকৃত মানবদেহের সবচেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থি। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষে এর ওজন প্রায় ১.৫–২.০০ কেজি। ডান, বাম, কোয়াড্রেট ও কডেট নামে ৪টি অসম্পূর্ণ খণ্ড নিয়ে যকৃত গঠিত। খণ্ডগুলো স্থিতিস্থাপক তন্তুসমৃদ্ধ গ্লিসনস ক্যাপসুলে আবৃত। ডান খণ্ডটি সবচেয়ে বড়। যকৃতের নিচের পিঠে **পিত্তথলি** (gall bladder) সংলগ্ন থাকে। প্রত্যেকটি খণ্ড বহুভূজাকার কোষে গঠিত। কোষগুলো একেকটি ক্ষুদ্র অণুখণ্ড নির্মাণ করে। প্রত্যেক অণুখণ্ডের কেন্দ্রে থাকে **কেন্দ্রীয় শিরা** (central vein)। যকৃত কোষগুলো চাকার স্পোকের মতো বিন্যস্ত। কোষগুলোর গা বেয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **সাইনুসয়েড** (sinusoid) ও **পিত্তনালিকা** প্রসারিত হয়। পিত্তনালিকাগুলো পিত্তনালিতে গিয়ে শেষ হয়। যকৃত থেকে আসা ডান ও বাম নালি মিলে একটি **অভিন্ন যকৃত নালি** গঠন করে। এটি পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে **অভিন্ন পিত্তনালি** গঠন করে যা **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampulla of vater) নামে নালির মাধ্যমে ডিওডেনামে উন্মুক্ত হয়।

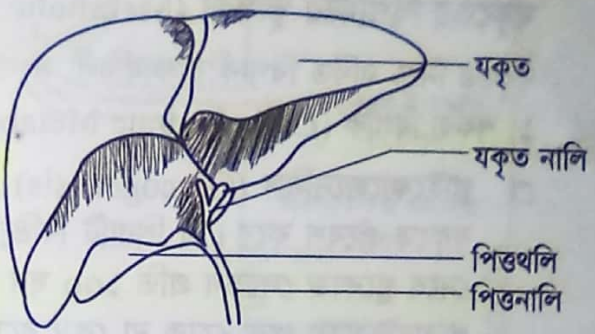

চিত্র ৩.৬ : মানুষের যকৃত

যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা (Storage & Metabolic Role of Liver)

মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি হচ্ছে যকৃত যা দেহের ওজনের প্রায় ৩–৫%। এটি মূলত পরিবর্তনশীল বাহ্যিক অবস্থা সত্ত্বেও দেহের অভ্যন্তরীণ স্থিতি বা সাম্য রক্ষাকারী গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। যকৃতে নানা ধরনের জৈব রাসায়নিক (biochemical) বিক্রিয়া সংঘটিত হয় যা দেহের **বিপাক** (metabolism) ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ জন্য একে মানবদেহের **জৈব রসায়নাগার** (organic laboratory) বলা হয়। যকৃত প্রায় পাঁচ শতাধিক জৈবনিক কাজ সম্পন্ন করে থাকে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। নিচে যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা (Storage functions of Liver)

নিচে যকৃতের সঞ্চয়ী ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. গ্লাইকোজেন সঞ্চয় (Storage of Glycogen) : ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে হেপাটিক পোর্টাল শিরা-র মাধ্যমে গ্লুকোজ যকৃতে প্রবেশ করে। রক্তের অতিরিক্ত গ্লুকোজ **গ্লাইকোজেনেসিস** (glycogenesis) প্রক্রিয়ায় গ্লাইকোজেন-এ রূপান্তরিত হয়ে যকৃতের সঞ্চয়ী কোষে জমা থাকে। **ইনসুলিন** (insulin) নামক হরমোন এ প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে। প্রয়োজনে এ গ্লাইকোজেন ভেঙ্গে রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা ঠিক রাখে।

২. রক্ত সঞ্চয় (Storage of Blood) : প্লীহা ও অন্ত্র থেকে বেরিয়ে রক্তবাহিকাগুলো মিলিত হয়ে **হেপাটিক পোর্টাল শিরা** গঠন করে। যকৃতের ভিতর দিয়ে রক্ত যদিও অনবরত প্রবাহিত হয় তারপরও এর রক্তবাহিকাগুলোসহ এ শিরা বিপুল পরিমাণ রক্তের **ভান্ডার** (reservoir) হিসেবে কাজ করে। যকৃত প্রায় ১৫০০ ঘন সে.মি. পর্যন্ত রক্ত সঞ্চয় করে রাখতে পারে যা দেহের বিভিন্ন রক্তক্ষরণ-জনিত ঘটনায় মূল রক্তসংবহনের সাথে মিলিত হয়ে রক্তচাপের সমন্বয় ঘটায়।

৩. ভিটামিন সঞ্চয় (Storage of Vitamins) : যকৃত স্নেহে (fat) দ্রবনীয় ভিটামিনসমূহ (A, D, E, K), পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন (B ও C), সায়ানো কোবালামিন এসিড (B_{12}) এবং ফলিক এসিড সঞ্চয় করে। B_{12} এবং ফলিক এসিড অস্থিমজ্জায় লোহিত কণিকা তৈরিতে প্রয়োজন হয়।

৪. পিত্তরস সঞ্চয় (Storage of Bile) : যকৃত কর্তৃক উৎপন্ন **পিত্তরস** (bile) যকৃতের ডান খন্ডাংশের নিচে অবস্থিত পিত্তথলিতে (gall bladder) জমা থাকে।

৫. চর্বি ও অ্যামিনো এসিড সঞ্চয় (Storage of Fat & Amino acid) : যে শর্করা (গ্লুকোজ) দেহে ব্যবহৃত হতে পারে না বা গ্লাইকোজেন হিসেবে সঞ্চিত থাকে না, যকৃত সেই অতিরিক্ত গ্লুকোজকে চর্বিতে পরিণত করে জমা রাখে।

যকৃত অ্যামিনো এসিডও জমা রাখে। দেহের প্রয়োজনে চর্বি এবং অ্যামিনো এসিড ব্যবহারযোগ্য গ্লুকোজে পরিণত হয়।

৬. মিনারেল সঞ্চয় (Storage of Mineral) : যকৃত লৌহ ও পটাসিয়াম সঞ্চয় করে। লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিন যকৃতের **কুফার** কোষের মাধ্যমে **হিম** (haem) ও **গ্লোবিন** (globin)-এ পরিণত হয়। হিমের লৌহ **ফেরিটিন** (ferritin) হিসেবে যকৃত জমা থাকে। এছাড়াও কপার, জিঙ্ক, কোবাল্ট ইত্যাদি মিনারেল স্বল্প যকৃতে সঞ্চিত থাকে।

যকৃতের বিপাকীয় ভূমিকা (Metabolic functions of Liver)

যকৃতে নিচে বর্ণিত বিপাকীয় কার্যাবলী সংঘটিত হয়।

১. শর্করা বিপাক (Carbohydrate Metabolism) : যকৃতে শর্করার বিপাককে নিচে বর্ণিত উপায়ে ব্যাখ্যা করা

- **গ্লাইকোজেনেসিস** (Glycogenesis) : অন্ত্র থেকে হেপাটিক পোর্টাল শিরার মাধ্যমে চিনি (যেমন-গ্লুকো যকৃতে প্রবেশ করে। এ শিরাটি বিভিন্ন মাত্রায় চিনি বহনকারী একমাত্র রক্তবাহিকা। শর্করা বিপাকে যকৃ দেহে গ্লুকোজ লেভেল প্রতি ১০০ ঘন সেন্টিমিটারে ৯০ মিলিগ্রাম গ্লুকোজ হিসেবে নিয়ন্ত্রণ করে। যে ধর খাবারই গ্রহণ করা হোক না কেন রক্তে গ্লুকোজ লেভেল যেন না বাড়ে বা কমে যকৃত তা প্রতিরোধ ক গ্যালাকটোজ, ফ্রুকটোজসহ সমস্ত হেক্সোজ চিনিকে যকৃত গ্লুকোজে পরিবর্তিত করে **গ্লাইকোজেন** (glyco নামক অদ্রবণীয় পলিস্যাকারাইড হিসেবে সঞ্চিত রাখে। গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন রূপান্তর প্রক্রি **গ্লাইকোজেনেসিস** বলে। প্রক্রিয়াটি ইনসুলিনের উপস্থিতিতে উদ্দীপ্ত হয়। **ইনসুলিন** (insulin) হচ্ছে চিনির লেভেল বেড়ে গেলে তার প্রতি সাড়া হিসেবে অগ্ন্যাশয়ের **আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স** (islets Langerhans) থেকে উৎপন্ন হরমোন।
- **গ্লুকোনিওজেনেসিস** (Gluconeogenesis) : গ্লুকোজের চাহিদার প্রেক্ষিতে যদি যকৃতে গ্লাইকোজেনের ঘ পড়ে তখন ননকার্বোহাইড্রেট উৎস যেমন অ্যামিনো এসিড ও গ্লিসারল প্রভৃতি থেকে গ্লুকোজ সংশ্লেষিত হ এ প্রক্রিয়াকে **গ্লুকোনিওজেনেসিস** বলে।

২. প্রোটিন বিপাক (Protein Metabolism) : প্রোটিন বিপাকে যকৃত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন ক এসব ভূমিকাকে নিচে বর্ণিত দুটি শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

- **ডিঅ্যামিনেশন** (Deamination) : কোন অ্যামিনো এসিড বা অন্য উপাদান থেকে অ্যামিনো গ্রুপের অপস প্রক্রিয়াকে **ডিঅ্যামিনেশন** বলে। খাদ্যের সঙ্গে গৃহীত অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড দেহ জমিয়ে রাখতে পারে যেগুলো প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য বা গ্লুকোনিওজেনেসিসে (গ্লুকোজ উৎপাদন) জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজন সেগুলো যকৃতের মধ্যেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।
- **প্লাজমা প্রোটিন উৎপাদন** (Production of Plasma Protein) : প্লাজমার অন্যতম আবশ্যকীয় উপা হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন, যেমন– অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন ইত্যাদি। অধিকাংশ প্লাজমা প্রোটিন যকৃতে অ্যামি এসিড থেকে সংশ্লেষিত হয়। এসব প্রোটিন রক্তের ভিতর দিয়ে ক্যালসিয়াম, পিত্ত, লবণ ও কিছু স্টেরয় হরমোন বহন করে (অ্যালবুমিন, প্লাজমা প্রোটিন)। গ্লোবিউলিনগুলো ইমিউনতন্ত্রের সুরক্ষা দেয়। রক্ত-জ বাঁধার ফ্যাক্টর **প্রোথ্রম্বিন** (prothrombin) ও **ফাইব্রিনোজেন** (fibrinogen) অত্যন্ত প্রয়োজনীয় প্লা প্রোটিন হিসেবে পরিচিত।

৩. ফ্যাট বিপাক (Fat Metabolism) : ফ্যাটগুলোকে জমা রাখার বদলে যকৃত এগুলোর পরিশোধন ও পরিবর্ত নিয়োজিত থাকে। যকৃত কোষ এক্ষেত্রে যে কাজ করে তা হচ্ছে অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেটকে ফ্যাটে রূপান্তর; এবং থেকে কোলেস্টেরল সরিয়ে নেওয়া, ভেঙ্গে ফেলা বা প্রয়োজনে সংশ্লেষ করা। গ্লুকোজের ঘাটতি হলে শ্বসনের উ যকৃত ফ্যাটকে ভেঙ্গে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত করে। ফ্যাটি এসিড বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থে পরিণত যকৃত থেকে নির্গত হয়। গ্লুকোনিওজেনেসিস প্রক্রিয়ায় গ্লিসারল গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়।

৪. **লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন ও ভাঙ্গন** (Production and Destruction of Red Blood Cells) : শিশুদেহে লোহিত কণিকা উৎপাদনে যকৃত নিয়োজিত থাকে। পরবর্তীতে অস্থিমজ্জার কোষগুলো এ দায়িত্ব পালন করে। এ প্রক্রিয়া একবার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে যকৃত তখন বিপরীত ভূমিকা পালনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অর্থাৎ যকৃত তখন লোহিত রক্তকণিকা ভাঙনে সহযোগিতা করে।

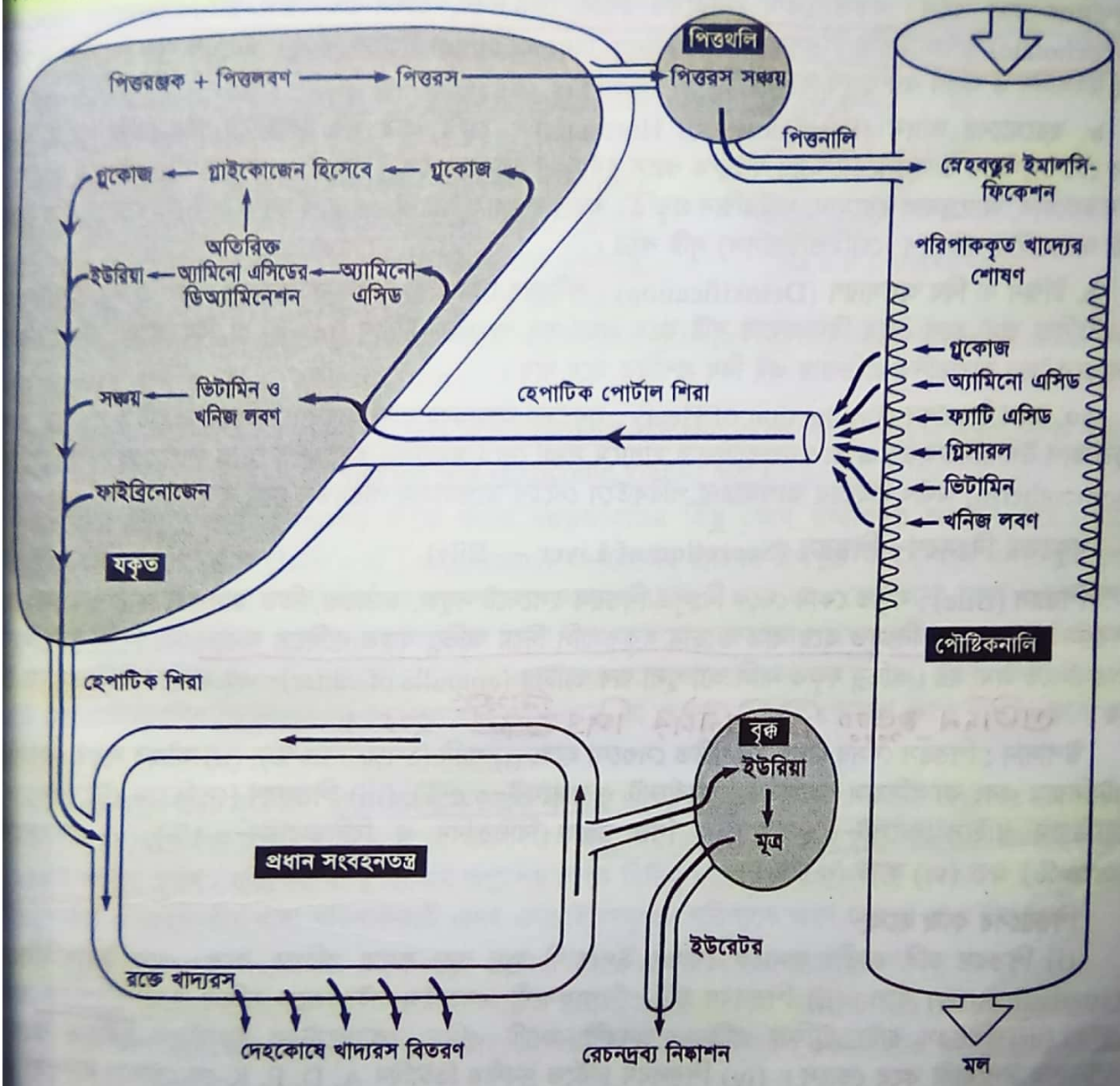

চিত্র ৩.৭ : যকৃতের সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকার চিত্ররূপ

৫. **হিমোগ্লোবিনের ভাঙ্গন** (Breakdown of Haemoglobin) : লোহিত রক্তকণিকার আয়ু ১২০ দিন (৪ মাস)। এগুলো যকৃত, প্লীহা ও অস্থিমজ্জায় ফ্যাগোসাইটিক ম্যাক্রোফেজ কোষের ক্রিয়ায় ভেঙ্গে যায় এবং কণিকার গ্লোবিন রক্তের প্লাজমায় মুক্ত হয়ে মিশে যায়। এগুলোকে তখন যকৃত, প্লীহা ও লসিকা গ্রন্থির **ম্যাক্রোফেজ** নামক শ্বেত-রক্তকণিকা গ্রহণ করে। যকৃতের ম্যাক্রোফেজকে **কুফার কোষ** (Kuppher cells) বলে। ম্যাক্রোফেজের ভরে হিমোগ্লোবিন ভেঙ্গে হিম ও গ্লোবিন গঠন করে। গ্লোবিন হচ্ছে অণুর প্রোটিন অংশ, এটি তার নিজস্ব অ্যামিনো এসিডে বিশ্লিষ্ট হয়। হিম থেকে আয়রন অংশ সরে গেলে অণুর বাকি অংশ **বিলিভারডিন** (biliverdin) নামে সবুজ রঞ্জক তৈরি করে। এ রঞ্জক হলদে **বিলিরুবিন** (bilirubin)-এ পরিবর্তিত হয়। আয়রন বর্জিত হয় না। এটি হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্য অস্থিমজ্জার কোষে পুনর্ব্যবহৃত হয়।

৬. কোলেস্টেরল উৎপাদন (Cholesterol Production): কোলেস্টরল বা ফ্যাটসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করলে প্রক্রিয়া শেষে যকৃতে কোলেস্টেরল উৎপন্ন হয়। হার্টঅ্যাটাক (coronory thrombosis) ও স্ট্রোক (cer thrombosis) সংক্রান্ত জটিলতায় কোলেস্টেরল বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

৭. পিত্ত উৎপাদন (Bile Production) : যকৃত কোষ (হেপাটোসাইট) অনবরত **পিত্ত** বা **পিত্তরস** ক্ষরণ কর পিত্তথলিতে জমা রাখে। যকৃত কোষ স্টেরয়েড থেকে পিত্ত লবণ, যেমন-সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট (so glycocholate) ও সোডিয়াম টরোকোলেট (sodium taurocholate) সংশ্লেষ করে। পরিপাক অঙ্গ হিসেবে যকৃ পিত্ত উৎপাদন ও ক্ষরণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৮. হরমোনের ভাঙ্গন (Breakdown of Hormone) : যকৃত প্রায় সব হরমোনই কম-বেশি ধ্বংস তবে টেস্টোস্টেরণ ও অ্যালডোস্টেরণ যতদ্রুত ধ্বংস হয় অন্য হরমোনগুলো (ইনসুলিন, গ্লুকাগোন, আন্ত্রিক হরমো যৌন হরমোন, অ্যাড্রেনাল হরমোন, থাইরক্সিন প্রভৃতি) ততদ্রুত ধ্বংস হয় না। এভাবে যকৃত বিভিন্ন হরমোনের ক স্থায়ী অভ্যন্তরীণ পরিবেশ (হোমিওস্ট্যাসিস) সৃষ্টি করে।

৯. টক্সিন বা বিষ অপসারণ (Detoxification) : শরীরের ভিতর স্বাভাবিক কর্মকান্ডের ফলে উৎপন্ন যেসব মাত্রাতিরিক্ত জমা হলে দেহে বিষময়তার সৃষ্টি করে এমন সব পদার্থকে **টক্সিন** (toxin) বা **বিষ** বলে। যকৃত অভ্যন্তরে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই বিষ প্রশমিত হয়ে যায়।

১০. তাপ উৎপাদন (Production of Heat) : যকৃতের অভ্যন্তরে নানা ধরনের বিক্রিয়া সংঘটিত হওয়ায় প্রচুর তাপ উৎপাদিত হয়। এ তাপ রক্তবাহিকার মাধ্যমে সমগ্র দেহে সঞ্চালিত হয়, ফলে দেহে তাপমাত্রা স্থিতিশী (homeotherm) অর্থাৎ বাইরের তাপমাত্রার পরিবর্তনে দেহের তাপমাত্রার পরিবর্তন ঘটে না।

যকৃতের নিঃসরণ- পিত্তরস (Secretion of Liver — Bile)

পিত্তরস (Bile) : যকৃত কোষ থেকে নিঃসৃত **পিত্তরস** হলদেটে সবুজ, আঠালো, তিক্ত স্বাদধারী ক্ষারীয় তরল পিত্তরস যকৃত থেকে নিঃসৃত হয়ে বাম ও ডান যকৃতনালি দিয়ে **অভিন্ন যকৃত নালি**তে আসে এবং **সিস্টিক নালি** পিত্তথলিতে জমা হয়। অভিন্ন যকৃত নালি **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampulla of vatter)- এর মাধ্যমে ডিওডেনামে হয়। প্রতিদিন ৮০০ মিলিলিটার পিত্তরস নিঃসৃত হয়।

উপাদান : পিত্তরস যেসব উপাদানে গঠিত সেগুলো হচ্ছে (i) **পানি** (৯৭% - ৯৮%), (ii) **অজৈব লবণ** (সো পটাসিয়াম এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড, কার্বোনেট ও ফসফেট-০.৫%), (iii) **পিত্তলবণ** (সোডিয়াম টোরোকো সোডিয়াম গ্লাইকোকোলেট-০.৮%), (iv) **পিত্ত রঞ্জক** (বিলিরুবিন ও বিলিভারডিন-০.২%), (v) **কোলে** (০.৩৮%) এবং (vi) **ফ্যাট** (০.৮%)।

পিত্তরসের কাজ হচ্ছে-

(i) পিত্তরস চর্বি জাতীয় খাদ্যকে শোষণ উপযোগী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত করে। একে **ইমালসিফি** (emulsification) বলে। (ii) পিত্তলবণ চর্বি পরিপাককারী এনজাইম লাইপেজকে সক্রিয় করে পরিপাকে করে। (iii) পিত্তরস হাইড্রোট্রফিক প্রক্রিয়ায় অদ্রবণীয় ফ্যাটি এসিড, কোলেস্টেরল ইত্যাদিকে দ্রবীভূত ক শোষণের উপযোগী করে তোলে। (iv) পিত্তলবণ চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন A, D, E, K-কে শোষণে সহায়ত (v) পিত্তরসের মাধ্যমে কপার, জিংক, পারদ, ট্রক্সিন জাতীয় পদার্থ, কোলেস্টেরল, পিত্তরস ইত্যাদি নিষ্কাশি (vi) পিত্তরসে অধিক ক্ষারক পদার্থের উপস্থিতির জন্য HCl কে প্রশমিত করে p^H এর সমতা বজায় রাখে এবং থেকে ডিওডেনামে আগত HCl কে প্রশমিত করে খাদ্য পরিপাকে সহায়তা করে। (vii) পিত্তলবণ পেরিস্ট্যালসিস (peristalsis) চলন বাড়িয়ে মল নিষ্কাশনে সহায়তা করে।

৩. অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

অবস্থান : অগ্ন্যাশয় পাকস্থলির নিচে অবস্থিত এবং উদর গহ্বরের ডিওডেনামের অর্ধবৃত্তাকার কুন্ডলীর ফাঁ প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত।

গঠন : অগ্ন্যাশয় ১২-১৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৫ সেন্টিমিটার চওড়া একটি **মিশ্র গ্রন্থি** (mixed gland)। যে দিকটি ডিওডেনামের কুন্ডলির ফাঁকে থাকে তার নাম **মাথা**; যে অংশ সংকীর্ণ হয়ে প্লীহা পর্যন্ত বিস্তৃত সেটি

মাথা ও লেজের মাঝের অংশকে **দেহ** বলে। অগ্ন্যাশয়ের গ্রন্থিগুলো থেকে ছোট ছোট নালিকা বেরিয়ে একত্রিত হয় এবং **উইর্সাং নালি** (duct of Wirsung) গঠন করে। এ নালি গ্রন্থির দৈর্ঘ্য বরাবর এসে ডিওডেনামের কাছে অভিন্ন পিত্তনালির সাথে মিলিত হয়ে **অ্যাম্পুলা অব ভ্যাটার** (ampula of vater)-এর মাধ্যমে ডিওডেনামে প্রবেশ করে।

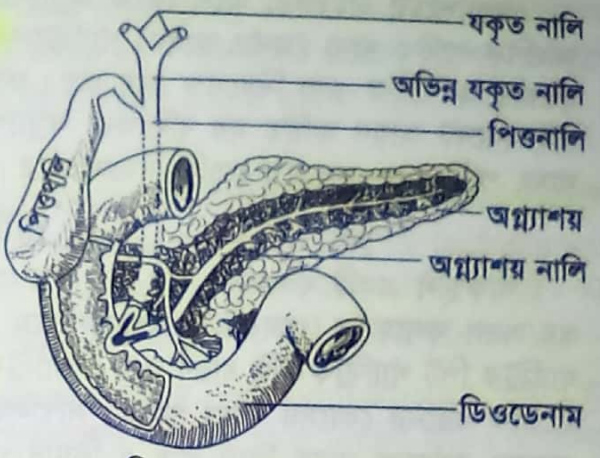

চিত্র ৩.৮ : মানুষের অগ্ন্যাশয়

অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্র গ্রন্থি হওয়ায় এটি বহিঃক্ষরা ও অন্তঃক্ষরা উভয় প্রকার গ্রন্থির সমন্বয়ে গঠিত।

বহিঃক্ষরা গ্রন্থি : অগ্ন্যাশয়ে অসংখ্য **লোবিউল** (lobule) বা **অ্যাসিনাস** (acinus) থাকে। প্রতিটি লোবিউল একটি কেন্দ্রীয় লুমেন (ক্ষুদ্র নালি) এবং লুমেনকে ঘিরে বৃত্তাকারে সজ্জিত একসারি কোষ নিয়ে গঠিত। লোবিউলের কোষ থেকে **অগ্ন্যাশয় রস** নিঃসৃত হয়। লুমেন প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র অগ্ন্যাশয় নালিকা। সকল অ্যাসিনাসের লুমেন বা ক্ষুদ্র অগ্ন্যাশয় নালিকাগুলো একত্রিত হয়ে প্রধান **অগ্ন্যাশয় নালি** বা **উইসাং নালি** গঠন করে।

লোবিউল বা অ্যাসিনাস নালিযুক্ত গ্রন্থি, তাই একে **সনাল গ্রন্থি** বলে এবং এদের ক্ষরণ বহির্মুখী অর্থাৎ নালির মাধ্যমে অগ্ন্যাশয় রস বাহিত হয় বলে এদের **বহিঃক্ষরা গ্রন্থি** (exocrene gland) বলে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি : লোবিউলগুলোর ফাঁকে ফাঁকে বহুভুজাকৃতির কিছু কোষ গুচ্ছাকারে অবস্থান করে। এদের **আইলেটস অব ল্যাংগারহ্যান্স** (Islet's of Langerhans) বা **ল্যাংগার হ্যান্সের দ্বীপপুঞ্জ** বলে। এতে ৪ ধরনের কোষ পাওয়া যায়। এই কোষগুলো নালিবিহীন এবং কোষগুলো থেকে **হরমোন** নিঃসৃত হয়। কোষগুলো হলো : (i) **আলফা কোষ** (α cell) - এটি **গ্লুকাগন** (glucagon) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। (ii) **বিটাকোষ** (β cell) - এটি **ইনসুলিন** (insulin) হরমোন ক্ষরণ করে যা রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ কমায়, (iii) **ডেল্টা কোষ** (δ cell) এটি **সোমাটোস্ট্যানিন** (somatostanin) হরমোন ক্ষরণ করে, যা আলফা ও বিটা কোষের ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং (iv) **গামা কোষ** (γ cell) – এটি পলিপেপটাইড ক্ষরণ করে।

পরিপাকে অগ্ন্যাশয়ের ভূমিকা : খাদ্য পাকস্থলি থেকে ক্ষুদান্ত্রে যাওয়ার সময় ক্ষারীয় তরলরূপী **অগ্ন্যাশয় রস** নিঃসৃত হয়। অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশ থেকে দুধরনের ক্ষরণ মিলে অগ্ন্যাশয় রস গঠন করে : (১) **পরিপাক এনজাইম** এবং (২) **একটি ক্ষারীয় তরল**। বহিঃক্ষরা গ্রন্থি হিসেবে অগ্ন্যাশয় থেকে বিভিন্ন ধরনের পরিপাককারী এনজাইম নিঃসৃত হয়। আমিষ, শর্করা ও স্নেহজাতীয় খাদ্য পরিপাককারী এসব এনজাইমসমূহের পরিপাকে অংশ গ্রহণের ধরণ নিম্নরূপ:

- **ট্রিপসিন** এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে পলিপেপটাইডে পরিণত করে।
- **কাইমোট্রিপসিন** এনজাইম প্রোটিওজ ও পেপটোন জাতীয় আমিষ অণুকে পলিপেটাইডে পরিণত করে।
- **কার্বক্সিপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজকে সরল পেপটাইডে ও অ্যামিনো এসিডে রূপান্তরিত করে।
- **অ্যামিনোপেপটাইডেজ** এনজাইম পলিপেপটাইডকে ভেঙ্গে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **ট্রাইপেপটাইডেজ** এনজাইম ট্রাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **ডাইপেপটাইডেজ** এনাজাইম ডাইপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।
- **কোলাজিনেজ** এনজাইম কোলাজেন জাতীয় প্রোটিনকে সরল পেপটাইডে রূপান্তরিত করে।
- **ইলাস্টেজ** এনজাইম যোজক টিস্যুর প্রোটিন ইলাস্টিনকে ভেঙ্গে পেপটাইড উৎপন্ন করে।
- **অ্যামাইলেজ** এনজাইম স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন জাতীয় জটিল শর্করাকে মল্টোজে পরিণত করে।
- **মল্টেজ** এনজাইম মল্টোজ জাতীয় শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।
- **লাইপেজ** এনজাইম চর্বি (লিপিড)-কে ভেঙ্গে ফ্যাটি এসিডে রূপান্তরিত করে।
- **কোলেস্টেরল এস্টারেজ** এনজাইম কোলেস্টেরল এস্টারকে ফ্যাটি এসিডে বিশ্লিষ্ট করে।

ট্রিপসিন, অ্যামাইলেজ ও লাইপেজ এর প্রধান কাজ অগ্ন্যাশয়।

অগ্ন্যাশয়ের বহিঃক্ষরা অংশ থেকে অগ্ন্যাশয় রসের অংশ হিসেবে ক্ষরিত হয় **বাইকার্বনেট** আয়ন। পাকস্থলী আংশিক পাচিত খাদ্য (অর্থাৎ কাইম) গ্যাস্ট্রিনের কর্মকান্ডে অতিমাত্রায় আম্লিক থাকে। বাইকার্বনেটের প্রকৃতি ক্ষারীয় হওয়ায় অর্ধপাচিত খাদ্য নিরপেক্ষ হয়ে যায়। ফলে এ খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে গেলেও আন্ত্রিক প্রাচীরের কোষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বাইকার্বনেট আয়ন ক্ষরিত হয় বহিঃক্ষরা অগ্ন্যাশয়ের নালিপ্রাচীরের কোষ থেকে। অগ্ন্যাশয় রস এভাবে অম্ল-ক্ষার সাম্য, পানিসাম্য, দেহতাপ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি (Gastric gland)

পাকস্থলি একটি থলিসদৃশ অঙ্গ এবং এর প্রাচীর পেশি এবং **মিউকোসা** (mucosa) দিয়ে গঠিত। এই মিউকোসা স্তর সরল **কলামনার** (স্তম্ভাকার) এপিথেলিয়ামে আবৃত যা প্রায় ৩.৫ মিলিয়ন **গ্যাস্ট্রিক পিট** (gastric pit) গঠন করে। গ্যাস্ট্রিক পিট **গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি** ধারণ করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি এক ধরনের নলাকার গ্রন্থি এবং চার ধরনের কোষ নিয়ে গঠিত। প্রত্যেক ধরনের কোষের ক্ষরণ পৃথক। সম্মিলিতভাবে গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির রসকে **গ্যাস্ট্রিক জুস** (gastric juice) বলে। একজন পুর্ণবয়স্ক মানুষ দিনে প্রায় ২ লিটার গ্যাস্ট্রিক জুস তৈরি করে। গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থির কোষগুলোর নাম ও কাজ নিম্নরূপ–

১. **অক্সিনটিক কোষ** (Oxyntic cell) : এগুলো **প্যারাইটাল কোষ** (parietal cell)-নামে পরিচিত এরা হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন করে।

২. **মিউকাস কোষ** (Mucous cell) : পিচ্ছিল মিউকাস উৎপন্ন করে।

৩. **আর্জেনটাফাইন কোষ** (Argentaffine cell) : গ্যাস্ট্রিক ইনট্রিনসিক ফ্যাক্টর সৃষ্টি করে।

৪. **জাইমোজেনিক কোষ** (Zymogenic cell) : জাইমোজেনিক কোষকে **পেপটিক** বা **চীফ কোষ**ও বলে। এ কোষ থেকে পেপসিনোজেন উৎপন্ন হয়।

৫. আন্ত্রিক গ্রন্থি (Intestinal glands) বা ক্রিপ্ট অব লিবারক্যুন (Crypts of Lieberkuhn)

অন্ত্রপ্রাচীরের মিউকোসা স্তরে কতগুলো এককোষী গ্রন্থি খাদ্য পরিপাককারী এনজাইম নিসরণ করে। এরা হচ্ছে– ব্রাশকোষ, গবলেট কোষ, প্যানেথ কোষ, আরজেন্টাফিন কোষ, লিবারক্যুন-এর গ্রন্থি এবং ব্রুনার-এর গ্রন্থি। গ্রন্থি থেকে নিসৃত রসকে **আন্ত্রিক রস** বা **সাক্কাস ইন্টেরিকাস** (intestinal juice or succus intericus) বলে।

আন্ত্রিক রসের উপাদান নিম্নরূপ:

i. **পানি:** ৯৮.৫%।

ii. **অজৈব পদার্থ :** ০.৮%- সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ।

iii. **জৈব পদার্থ :** ০.৭%, **সক্রিয়ক**-এন্টারোকাইনেজ; **এনজাইম**-ট্রিপসিনোজেন, পেপটাইডেজ, অ্যামাইলেজ, মল্টেজ, ল্যাক্টেজ, সুক্রেজ, লাইপেজ ইত্যাদি।

আন্ত্রিক রসের কাজ

i. আন্ত্রিক রসে বিদ্যমান **মিউকাস** অন্ত্রের প্রাচীরকে বিভিন্ন এনজাইমের ক্রিয়া থেকে রক্ষা করে।

ii. এতে উপস্থিত সক্রিয়ক এন্টারোকাইনেজ নিষ্ক্রিয় **ট্রিপসিনোজেনকে ট্রিপসিনে** পরিণত করে।

iii. এতে বিদ্যমান মল্টেজ, সুক্রেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম যথাক্রমে, মল্টোজ, সুক্রোজ ও ল্যাক্টোজ শর্করাকে গ্লুকোজে পরিণত করে।

iv. এতে অবস্থিত পেপটাইডেজ এনজাইম পলিপেপটাইডকে অ্যামিনো এসিডে পরিণত করে।

পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা
(Role of Nervous System & Hormone in Digestion)

খাদ্য পরিপাক ও শ্বসন যে জটিল প্রক্রিয়া তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব প্রক্রিয়া শেষে উৎপন্ন হয় শক্তি। শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারই হচ্ছে সুস্থ জীবন অব্যাহত রাখার একমাত্র কৌশল। শক্তির সংরক্ষণ ও ব্যবহার প্রক্রিয়া কিভাবে সূক্ষ্মভাবে দেহে পরিচালিত হচ্ছে সে বিষয়টি পরিষ্কার জানতে হলে পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনের ভূমিকা সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

পরিপাকের জন্য বিভিন্ন এনজাইম ও অন্যান্য পদার্থের (যেমন–HCl) ক্ষরণ হয় শক্তির বিনিময়ে। শক্তির উৎপাদন ও ব্যবহার কখনও বৃথা যায় না। এ কারণে খাদ্যের অনুপস্থিতিতে শক্তি ও পদার্থ উৎপন্ন হয় না। বরং খাদ্য পরিপাকের উদ্দেশেই বিপুল পরিমাণ **গ্যাস্ট্রিক জুস** (gastric juice) উৎপন্ন ও ক্ষরিত হয়। পরিপাকের প্রত্যেক ধাপের কর্মকাণ্ডে স্নায়ুতন্ত্র ও হরমোনতন্ত্র (অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিতন্ত্র; endocrine system) নিম্নোক্তভাবে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে।

পরিপাকে স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (central nervous system) পৌষ্টিকতন্ত্র সংশ্লিষ্ট স্নায়ু দ্বারা উত্তেজিত হয় এবং বিভিন্ন নির্দেশনা ও সংকেত প্রেরণের মাধ্যমে পৌষ্টিকনালি ও গ্রন্থিগুলোকে পরিচালনা করে। এতে স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (autonomous nervous system)-ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে। পরিপাক ক্রিয়া দুটি ভিন্ন ধরনের স্নায়ুজালক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়, যেমন– (i) **বহির্নিহিত স্নায়ুজালক** (extrinsic plexus) এবং (ii) **অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক** (intrinsic plexus)।

স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের **সিমপ্যাথেটিক** (sympathetic) ও **প্যারাসিমপ্যাথেটিক** (parasympathetic) শাখা থেকে আগত বহির্নিহিত স্নায়ুজালক পৌষ্টিকনালির বাহির থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। অপরদিকে পৌষ্টিকনালির প্রাচীরে ঘনসন্নিবিষ্ট জালিকা গঠন করে বিন্যস্ত থেকে অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক পৌষ্টিকনালির ভিতর থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে পরিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। দুধরনের অন্তর্নিহিত স্নায়ুজালক পৌষ্টিকতন্ত্রের সংক্ষিপ্ত প্রতিবর্তী ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। একটি হচ্ছে– পৌষ্টিকনালির বাইরের দিকে অবস্থিত **মায়েনটেরিক স্নায়ুজালক** (myenteric pelexus) যা পৌষ্টিকতন্ত্রের মসৃণ পেশিগুলোর সঙ্কোচন বা পেরিস্ট্যালসিস ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্যটি **সাব–মিউকোসাল স্নায়ুজালক** (submucosal plexus) যা পৌস্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন ধরনের নিঃসরণ ও স্থানীয় রক্ত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে।

১. লালাক্ষরণ : দুধরনের প্রতিবর্ত ক্রিয়া মুখগহ্বরে লালাক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রথমটি হচ্ছে **অনপেক্ষ প্রতিবর্ত,** দ্বিতীয়টি **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া**।

খাদ্য মুখগহ্বরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে **অনপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া** (unconditional reflex; অর্থাৎ উদ্দীপনা-সাড়াদান শেখার বিষয় নয়) শুরু হয়ে যায়। জিভের স্বাদকুঁড়ির গ্রাহক বা রিসেপ্টর খাদ্যের স্বাদে উদ্দীপ্ত হয়। এসব রিসেপ্টর থেকে সেন্সরি নিউরোন **স্নায়ুউদ্দীপনা** (nerve impluse) মস্তিষ্কে বহন করে। মস্তিষ্ক থেকে মোটর নিউরোনের সাহায্যে স্নায়ু উদ্দীপনা লালাগ্রন্থিতে এলে সেখান থেকে লালা ক্ষরিত হয়। যে প্রতিবর্ত ক্রিয়া মস্তিষ্ক হয়ে অতিক্রম করে তাকে **করোটিক প্রতিবর্ত** (cranial reflex) বলে।

দ্বিতীয় প্রতিবর্ত ক্রিয়া হচ্ছে **সাপেক্ষ প্রতিবর্ত** (conditional reflex; সাড়াটি শিক্ষণজনিত)। খাবার দেখে, গন্ধ শুঁকে, চিন্তাভাবনা শেষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এ প্রতিবর্তের অন্তর্ভুক্ত। কেউ যদি একান্তে বসে তেঁতুল যা চালতার আচার মুখে দেওয়ার কথা চিন্তা করে তাহলে হয়তো লালা ক্ষরণ শুরু হয়ে যাবে। এসব আচার খাওয়ার অভিজ্ঞতা যার আছে তার ক্ষেত্রে এমনটি ঘটবে। অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষা গ্রহণকে সাপেক্ষ প্রতিবর্ত বলে।

২. গ্যাস্ট্রিক জুস (রস) ক্ষরণ : গ্যাস্ট্রিক জুসের ক্ষরণ হয় ৩টি ধাপে যেমন- (i) **স্নায়বিক** বা **সেফালিক পর্যায়** (Cephalic phase), (ii) **গ্যাস্ট্রিক পর্যায়** (Gastric phase) এবং (iii) **আন্ত্রিক পর্যায়** (Intestinal phase)।

i. **স্নায়বিক পর্যায় :** মুখগহ্বরে খাদ্যের উপস্থিতি ও গলাধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়বিক প্রতিবর্ত (স্নায়ুউদ্দীপনা) শুরু হয়ে যায়। এ উদ্দীপনা মস্তিষ্ক থেকে **ভ্যাগাস স্নায়ুর** মাধ্যমে পাকস্থলিতে পৌছায়। খাদ্য দেখা, গন্ধ ও স্বাদ নেওয়া, এমনকি চিন্তা করলেও একই অবস্থা হবে। পাকস্থলির গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিগুলো **গ্যাস্ট্রিক জুস** ক্ষরণে উদ্দীপ্ত হয়। এটি হচ্ছে প্রস্তুতি পর্ব। পাকস্থলিতে খাদ্য পৌঁছার আগেই এটি ঘটে এবং এভাবে পাকস্থলি খাদ্য গ্রহণে প্রস্তুত হয়। পাকস্থলির ক্ষরণে স্নায়বিক পর্যায় প্রায় এক ঘন্টা স্থায়ী হয়।

ii. **গ্যাস্ট্রিক পর্যায় :** এটি অনুষ্ঠিত হয় পাকস্থলিতে। খাদ্য ধারণে পাকস্থলি প্রসারিত হলে **প্রসারণ গ্রাহক** (stretch receptor) উদ্দীপ্ত হয় এবং পাকস্থলির সাবমিউকোসায় অবস্থিত স্নায়ু জালিকায় স্নায়ুউদ্দীপনা প্রেরণ করে। সেখান থেকে স্নায়ুউদ্দীপনা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থিতে পৌছে জুস ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে। গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণ প্রায় ৪ ঘন্টা স্থায়ী হয়।

iii. **আন্ত্রিক পর্যায় :** এ পর্বটি ক্ষুদ্রান্ত্রে সংঘটিত হয়। এসিডধর্মী কাইম যখন প্রবেশ করে এবং ডিওডেনামের প্রাচীর স্পর্শ করে তখন স্নায়বিক সাড়া প্রদানকে উৎসাহিত করে। ক্ষুদ্রান্ত্র প্রাচীরের রিসেপ্টরগুলো খাদ্যের উপস্থিতিতে উদ্দীপ্ত

হওয়ার খবর মস্তিষ্কে পৌঁছালে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অংশ হিসেবে মস্তিষ্ক গ্যাস্ট্রিক জুসের ক্ষরণ কমিয়ে দেয় এবং পাকস্থলী থেকে কাইমের নির্গমন গতি মন্থর করে দেয়। এর ফলে একসঙ্গে বেশি খাদ্য অন্ত্রে প্রবেশ করতে পারে না। শুধু তাই নয়, ডিওডেনামের মিউকোসা দুধরনের হরমোন ক্ষরণ করে, কোলেসিস্টোকাইনিন (Cholecystokinin, CCK) এবং সিক্রেটিন (Secretin)। CCK আবার প্যাংক্রিওজাইমিন (Pancreozymin) নামেও পরিচিত। উভয় হরমোনই রক্ত সংবহিত হয়ে পাকস্থলি, অগ্ন্যাশয় ও যকৃতে পৌঁছায়। সিক্রেটিন পাকস্থলিতে গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণে বাঁধা দেয়, আর CCK পাইলোরিক স্ফিংক্টারের পেশিকে সংকুচিত করে পাকস্থলি শূন্য হতে বাধা দেয়।

৩. অগ্ন্যাশয় রস ও পিত্ত : অগ্ন্যাশয় রস ও পিত্তের ক্ষরণেও স্নায়বিক প্রতিবর্তের ভূমিকা আছে। পাকস্থলির পরিপাকের স্নায়বিক ও গ্যাস্ট্রিক ধাপে ভ্যাগাস স্নায়ু যকৃতকে পিত্ত ও অগ্ন্যাশয়কে এনজাইম ক্ষরণে উদ্দীপ্ত করে।

পরিপাকে হরমোনের ভূমিকা

খাদ্য পরিপাকে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন ধরনের এনজাইমের নিঃসরণ কয়েকটি নির্দিষ্ট হরমোন দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। হরমোনগুলো পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসা স্তরের কোষ থেকে ক্ষরিত হয়ে পৌষ্টিকতন্ত্রের বিভিন্ন রক্তবাহিকার মাধ্যমে হৃৎপিন্ডে পৌছে। হৃৎপিন্ড থেকে ধমনির মাধ্যমে পুনরায় পৌষ্টিকতন্ত্রে এসে পৌছায় এবং এনজাইম নিঃসরণ ও অন্ত্রের সঞ্চালন কাজকে উদ্দীপিত করে। নিচে খাদ্য পরিপাক নিয়ন্ত্রণকারী কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ হরমোন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. গ্যাস্ট্রিন (Gastrin) : পাকস্থলির পাইলোরিক প্রান্তের গ্রন্থিগুলোর গাত্রের **জি–কোষ** থেকে গ্যাস্ট্রিন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে পাকস্থলির প্রাচীরে অবস্থিত গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি থেকে **গ্যাস্ট্রিক জুস** নিঃসৃত হয়। এটি HCl এর ক্ষরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং অন্ননালি থেকে পাকস্থলিতে খাদ্যগ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

২. সিক্রেটিন (Secretion) : অন্ত্রের (ডিওডেনামের) মিউকোসা থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অগ্ন্যাশয় থেকে **অগ্ন্যাশয় রস** নিঃসৃত হয়। তাছাড়া এটি পাকস্থলির প্রাচীরকে পেপসিন এনজাইম এবং যকৃতকে পিত্ত (bile) ক্ষরণে উদ্দীপিত করে। এটি প্রথম আবিষ্কৃত হরমোন ।

৩. কোলেসিস্টোকাইনিন (Cholecystokinin) : এর অপর নাম প্যানক্রিওজাইমিন। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত হরমোনটি অগ্ন্যাশয়ের বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণকে উদ্দীপিত করে। এটি পিত্তথলি থেকে পিত্ত বের হতেও উদ্দীপনা যোগায়।

৪. সোমাটোস্টাটিন (Somatostatin) : এ হরমোনটি পাকস্থলি ও অন্ত্রের মিউকোসাতে অবস্থিত **ডি–কোষ** থেকে ক্ষরিত হয়। এটি গ্যাস্ট্রিনের ক্ষরণ নিবারণ করে ফলে পাকস্থলি রসের ক্ষরণ হ্রাস পায়। এটি অগ্ন্যাশয় রসের ক্ষরণ ও হ্রাস করে।

৫. এন্টেরোকাইনিন (Enterokinin) : ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে ইলিয়ামের প্রাচীরে বিদ্যমান আন্ত্রিক গ্রন্থি থেকে মল্টেজ, সুক্রেজ, ইনভারটেজ ও ল্যাক্টেজ এনজাইম নিঃসৃত হয়।

৬. পেপটাইড YY (Peptide YY) : ইলিয়ামের প্রাচীর থেকে এ হরমোন ক্ষরিত হয়। এর প্রভাবে অন্ত্রের ভিতর দিয়ে ধীর গতিতে খাদ্য প্রবাহিত হয় যাতে দক্ষতার সাথে খাদ্যের পরিপাক ও শোষণ সম্পন্ন হয়।

৭. এন্টারোগ্যাস্ট্রোন (Enterogastrone = Gastric Inhibitory Peptide–GIP) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে নিঃসৃত হয়। এ হরমোন পাকস্থলির বিচলন ও গ্যাস্ট্রিক জুস নিঃসরণে বাধা সৃষ্টি করে। গ্যাস্ট্রিক সংকোচন হ্রাস করার জন্য একে গাস্ট্রিক ইনহিবিটরি পেপটাইড বলা হয়।

৮. এন্টারোক্রাইনিন (Enterocrinin) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে ক্ষরিত হয়। এটি লিবারকুন গ্রন্থিকে (crypts of liberkuhn) উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।

৯. ডিওক্রাইনিন (Deocrinin) : এটি ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর (ডিওডেনাম) থেকে ক্ষরিত হয়। এ হরমোন ব্রুনারের গ্রন্থিকে উদ্দীপিত করে আন্ত্রিক রসে এনজাইম ও মিউকাস ক্ষরণ করে।

১০. প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড (Pancreatic Polypeptide) : এটি আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্সের প্যানক্রিয়েটিক পলিপেপটাইড কোষ থেকে ক্ষরিত হয় এবং অগ্ন্যাশয় রস ক্ষরণে বাধা দেয়।

১১. ভিল্লিকাইনিন (Villikinin) : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রাচীর থেকে এ হরমোন নিঃসৃত হয় এবং ভিলাই এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে।

পৌষ্টিকনালির বিভিন্ন অংশে খাদ্য পরিপাকের রূপরেখার ছক

পরিপাকস্থল	পরিপাকগ্রন্থি ও পরিপাকরস	পরিপাকরসের এনজাইম	প্রভাবিত খাদ্যের নাম	সরলীকৃত উপাদান
মুখবিবর	লালাগ্রন্থি নিঃসৃত "লালারস"	**কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী** ১. টায়ালিন ২. মল্টেজ (অল্পমাত্রায়)	স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন মল্টোজ	মল্টোজ গ্লুকোজ
পাকস্থলি	গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত "পাকরস"	**প্রোটিন পরিপাককারী** ১. পেপসিন ২. জিলেটিনেজ ৩. রেনিন	প্রোটিন জিলেটিন দুগ্ধ কেসিন	প্রোটিওজ ও পেপটোন পেপটোন ও পলিপেপটাইড প্যারাকেসিন
		লিপিড পরিপাককারী ১. লাইপেজ	লিপিড	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল
ক্ষুদ্রান্ত	অগ্ন্যাশয় নিঃসৃত "অগ্ন্যাশয় রস"	**প্রোটিন পরিপাককারী** ১. ট্রিপসিন ২. কাইমোট্রিপসিন ৩. কার্বোক্সিপেপটাইডেজ ৪. অ্যামিনোপেপটাইডেজ ৫. ট্রাইপেপটাইডেজ ৬. ডাইপেপটাইডেজ ৭. কোলাজিনেজ	প্রোটিওজ ও পেপটোন প্রোটিওজ ও পেপটোন পলিপেপটাইডের প্রান্তীয় লিঙ্কেজ পলিপেপটাইড ট্রাইপেপটাইড ডাইপেপটাইড কোলাজেন	পলিপেপটাইড পলিপেপটাইড সরল পেপটাইড ও অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড অ্যামিনো এসিড সরল পেপপাইড
		শর্করা পরিপাককারী ১. অ্যামাইলেজ ২. মল্টেজ	স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন মল্টোজ	মল্টোজ গ্লুকোজ
		লিপিড পরিপাককারী ১. লাইপেজ ২. ফসফোলাইপেজ ৩. কোলেস্টেরল এস্টারেজ	চর্বি (লিপিড) ফসফোলিপিড কোলেস্টেরল এস্টার	ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল ফ্যাটি এসিড ফ্যাটি এসিড
	আন্ত্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত এনজাইমসমূহ	**প্রোটিন পরিপাককারী** ১. অ্যামিনোপেপটাইডেজ	পেপটাইড অণু	অ্যামিনো এসিড
		লিপিড পরিপাককারী ১. লাইপেজ ২. অ্যালকালাইন ফসফেটেজ	ট্রাইগ্লিসারাইড ও ডাইগ্লিসারাইড ফসফোলিপিড	মনোগ্লিসারাইড ও ফ্যাটি এসিড গ্লিসারল, ফ্যাটি এসিড, ফসফোরিক এসিড এবং এদের বেস (যেমন-কোলিন)
		কার্বোহাইড্রেট পরিপাককারী ১. ল্যাক্টেজ ২. মল্টেজ ৩. সুক্রেজ ৪. অ্যামাইলেজ	ল্যাক্টোজ মল্টোজ সুক্রোজ স্টার্চ ও ডেক্সট্রিন	গ্লুকোজ ও গ্যালাক্টোজ গ্লুকোজ গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ সরল শর্করা
		নিউক্লিক এসিড পরিপাককারী ১. নিউক্লিয়েজেস ২. নিউক্লিওটাইডেজ ৩. নিউক্লিওসাইডেজ	নিউক্লিক এসিড নিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড	মনোনিউক্লিওটাইড নিউক্লিওসাইড ও ফসফেট গ্রুপ পেন্টোজ সুগার ও নাইট্রোজেন বেস

খাদ্যবস্তুর শোষণ (Absorption of Food)

ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম অংশে পরিপাকের চূড়ান্ত পর্যায়ের শেষে উৎপন্ন পদার্থ শোষিত হয়। এর অন্তঃপ্রাচীরে অবস্থিত অসংখ্য ক্ষুদ্র অভিক্ষেপ বা **ভিলাই** (villi; একবচনে villus)- শোষণের জন্য যথাযথভাবে অভিযোজিত। ভিলাইগুলোর উপরিভাগের তল স্তম্ভাকার আবরণী কোষ দিয়ে আবৃত থাকে। মানুষের অন্ত্রে প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) ভিলাই থাকে। ক্ষুদ্রান্ত্রে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যের শোষণ প্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. শর্করা শোষণ (Absorption of Carbohydrate) : গ্লুকোজ ও গ্যালাকটোজ ক্ষুদ্রান্ত্রের মিউকাস ঝিল্লির কাইনেজ নামক এনজাইমের সহায়তায় অতি দ্রুত ফসফরাস যুক্ত হয়ে সক্রিয় শোষণের মাধ্যমে শোষিত হয়ে পোর্টাল শিরা-র রক্তে প্রবেশ করে। ফ্রুক্টোজ, সুক্রোজ ও ল্যাকটোজ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় শোষিত হয়। পোর্টাল শিরায় শোষিত খাদ্যসার যকৃতে মুক্ত করে।

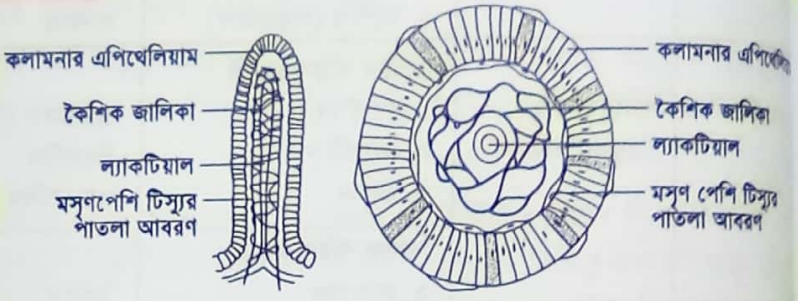

চিত্র ৩.৯ : একটি ভিলাস (বায়ে–লম্বচ্ছেদ; ডানে–প্রস্থচ্ছেদ)

২. আমিষ শোষণ (Absorption of Protein) : আমিষের পরিপাকজাত অ্যামিনো এসিডগুলো শোষিত হয়ে পোর্টাল শিরার রক্তে প্রবেশ করে এবং সেখান থেকে যকৃতে পৌঁছে। সাধারণত এল-অ্যামিনো এসিডগুলো সক্রিয় পদ্ধতিতে এবং ডি-অ্যামিনো এসিডগুলো ব্যাপনের মাধ্যমে শোষিত হয়। অ্যামিনো এসিড ব্যতীত কিছু প্রোটিজ পেপটোন ও পলিপেপটাইড অণু অপরিবর্তিত অবস্থায় সামান্য পরিমাণে শোষিত হয়।

৩. চর্বি বা লিপিড শোষণ (Absorption of Lipid) : চর্বির পরিপাকজাত ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ভিলাইয়ের স্তম্ভাকার এপিথেলিয়াম কোষে প্রবেশ করে এবং পুনরায় লিপিডে পরিণত হয়। এপিথেলিয়াল কোষে যে প্রোটিন থাকে তা লিপিড অণুকে আবৃত করে লিপোপ্রোটিন কণা গঠন করে, তার নাম **কাইলোমাইক্রন** (chylomicrons)। এগুলো **এক্সোসাইটোসিস** (exocytosis) প্রক্রিয়ায় এপিথেলিয়াল কোষ ত্যাগ করে এবং ভিলাইয়ের লসিকা বাহিকায় প্রবেশ করে। লসিকা তখন সাদা বর্ণ ধারণ করে। এ কারণে তখন লসিকা বাহিকাকে **ল্যাকটিয়েল** (lacteal) বলে। ল্যাকটিয়েল অর্থ হচ্ছে **সাদাটে** (milky)। কাইলোমাইক্রনগুলো লসিকার মাধ্যমে লসিকাতন্ত্রের ভেতর দিয়ে হৃৎপিন্ডের কাছে শিরারক্তের প্লাজমায় প্রবেশ করে। প্লাজমায় একটি এনজাইম লিপিডকে বিশ্লিষ্ট করে আবার কোষের গ্রহণ উপযোগী ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল সৃষ্টি করে। এগুলো শ্বসনে ব্যবহৃত হয় কিংবা স্নেহ পদার্থ (fat) হিসেবে যকৃত, মেসেন্টারি বা চামড়ার নিচে সঞ্চিত থাকে।

৪. পানি শোষণ (Absorption of Water) : ক্ষুদ্রান্ত্রই পানি শোষণের প্রধান স্থান। ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের প্রাচীরের এপিথেলিয়াম কোষ দ্বারা অভিস্রবণ প্রক্রিয়ায় পানি শোষিত হয়। ক্ষুদ্রান্ত্রের শোষণের পর অবশিষ্ট পানি বৃহদান্ত্রে প্রবেশ করে।

৫. খনিজ লবণ শোষণ (Absorption of Minerals) : ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিলাইয়ের প্রাচীরের এপিথেলিয়াল কোষ দ্বারা সক্রিয় পদ্ধতিতে খনিজ লবণ শোষিত হয়।

৬. ভিটামিন শোষণ (Absorption of Vitamins) : খাদ্যের ভিটামিন A, D, E, K ক্ষুদ্রান্ত্রে শোষিত হয়। সাধারণ পিত্তলবণ এই প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে। ভিটামিন C ও কয়েক প্রকার B ভিটামিন ব্যাপন ও সক্রিয়া শোষণ পদ্ধতিতে ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়াম অংশে শোষিত হয়।

শোষিত খাদ্যসারের পরিণতি (Fate of absorbed Food Nutrients)

অ্যামিনো এসিড : অ্যামিনো এসিড কোষে গৃহীত হয়ে এনজাইমের সহায়তায় প্রোটিন গঠনে ব্যবহৃত হয়। অপ্রয়োজনীয় এবং অতিরিক্ত অ্যামিনো এসিড যকৃতে পরিবর্তিত হয়ে একদিকে ইউরিয়া এবং অন্যদিকে শর্করা বা চর্বিতে রূপান্তরিত হয়। ইউরিয়া বর্জ্য পদার্থ। শর্করা বা চর্বি শক্তি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

গ্লুকোজ : গ্লুকোজ থেকে কোষে শক্তি উৎপন্ন হয়। কিন্তু গ্লুকোজ অন্যান্য বস্তুর সাথে মিলিত হয়ে প্রোটোপ্লাজমের টোলিক উপাদান গঠন করে এবং কিছু গ্লুকোজ যকৃত ও পেশিতে গ্লাইকোজেন হিসেবে জমা থাকে।

ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল : ফ্যাটি এসিডের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে প্রাণী নিজ দেহের উপযোগী চর্বি তৈরি করে। কিন্তু যাটি এসিড প্লাজমামেমব্রেন ও নিউক্লিয়ার মেমব্রেন গঠনে ব্যবহৃত হয়। চর্বির শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা গ্লুকোজের তুলনায় দ্বিগুণ। শোষিত খাদ্যবস্তুর প্রোটোপ্লাজমে রূপান্তরকে আত্তীকরণ বলি।

বৃহদন্ত্রের কাজ (Functions of Large Intestine)

খাদ্যের পরিপাক এবং পরিপাককৃত খাদ্য দেহে শোষণের পর যে অংশটুকু অপাচ্য থাকে বা শোষিত হয় না, তা বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। মানুষের পৌষ্টিকতন্ত্রের ক্ষুদ্রান্ত্রের ইলিয়ামের পেছন থেকে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত মোটা, নলাকার ও সংযুক্ত অংশকে বৃহদন্ত্র বলে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১.৫ মিটার। এটি তিন অংশে বিভক্ত। সম্মুখের জেজুনাম সংলগ্ন স্ফীত থলাকৃতির অংশকে **সিকাম** (caecum), মধ্যবর্তী U আকৃতির বৃহৎ অংশকে **কোলন** (colon) এবং পশ্চাতের পায়ু সংলগ্ন থলি আকৃতির অংশকে **মলাশয়** (rectum) বলে। সিকামের সাথে একটি বদ্ধ ধরনের থলি যুক্ত থাকে। একে **অ্যাপেনডিক্স** (appendix) বলে। কোলনের আবার ৪টি অংশ– (i) **উর্ধ্বগামী কোলন** (ascending colon), (ii) **অনুপ্রস্থ কোলন** (transverse colon), (iii) **নিম্নগামী কোলন** (descending colon) এবং (iv) **সিগময়েড কোলন** (sigmoid colon)। মানুষের বৃহদন্ত্র প্রধানত নিম্নবর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করে।

১. ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া : মলাশয় ও সিকামে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া (প্রায় ৫০০ প্রজাতির) মিথোজীবী হিসেবে বাস করে। এসব ব্যাকটেরিয়া উদ্ভিদতন্তুর সেলুলোজ, হেমিসেলুলোজ (যেগুলো পরিপাক করার মতো এনজাইম মানুষের পৌষ্টিকনালি থেকে নিঃসৃত হয়না) প্রভৃতির ফারমেন্টেশন ও হাইড্রোলাইসিস ঘটিয়ে ক্ষুদ্র খাদ্যাণুতে পরিণত করে।

২. শোষণ : ক্ষুদ্রান্ত্র থেকে আগত পরিপাক বর্জ্যে বিদ্যমান পানির প্রায় ৭০–৮০% অভিস্রবণের মাধ্যমে বৃহদন্ত্রে শোষিত হয়ে কঠিন মলের আকার ধারণ করে। কিছু পরিমাণ অজৈব লবণ, গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, ফলিক এসিড, ভিটামিন-B এবং K বৃহদন্ত্রে শোষিত হয়।

৩. ক্ষরণ : বৃহদন্ত্রের মিউকোসা স্তরে অবস্থিত **গবলেট কোষ** (goblet cell) মিউকাস ক্ষরণ করে বৃহদন্ত্রের অভ্যন্তর ভাগকে পিচ্ছিল রাখে।

৪. খাদ্যের অসার অংশ সঞ্চয় : ক্ষুদ্রান্ত্রের পরিপাক ও শোষণের পর খাদ্য ও পাচকরসগুলোর অবশিষ্ট উপাদান পেরিস্টলটিক পেশিবলয় অতিক্রম করে সিকাম ও কোলনে প্রবেশ করে এবং সেখানে দীর্ঘসময় জমা থাকে।

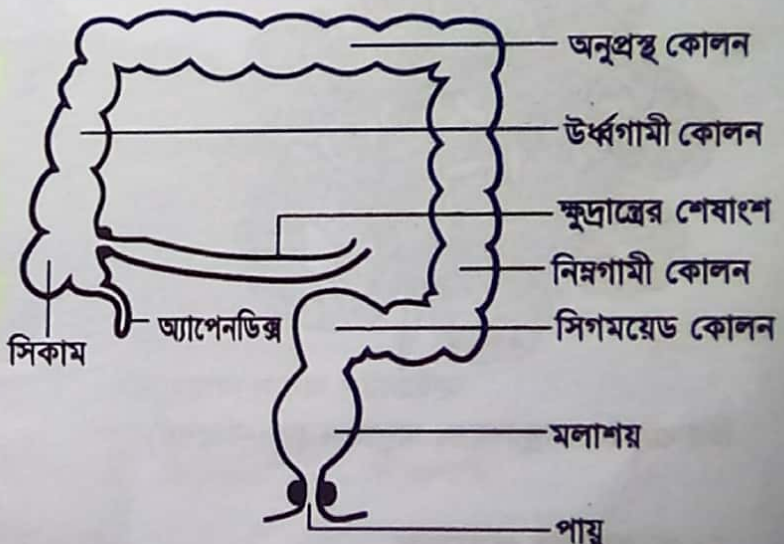

চিত্র ৩.১০ : মানুষের বৃহদন্ত্রের বিভিন্ন অংশ

৫. মল উৎপাদন : দৈনিক প্রায় ৩৫০ গ্রাম **তরল মন্ড** (chyle) বৃহদন্ত্রে প্রবেশ করে। মন্ড থেকে শোষণের মাধ্যমে প্রায় ১৩৫ গ্রাম **আর্দ্র মল** (faeces) উৎপন্ন হয়ে দেহের বাইরে নিষ্ক্রান্ত হয়।

মলত্যাগ (Defaecation) : যে প্রক্রিয়ায় খাদ্যের অপাচ্য অংশ মলরূপে দেহের বাইরে নির্গত হয় তাকে **মল ত্যাগ** বা **ডেফিকেশন** বা **ইজেসশন** বলে। খাদ্যের অপাচ্য, অশোষিত ও দেহে পুষ্টিমূল্যহীন বস্তুকে **রাফেজ** (roughage) বলে। এই রাফেজ বিশেষ প্রক্রিয়ায় মলে পরিণত হয়। বৃহদন্ত্রের প্রাচীর থেকে ক্ষরিত মিউকাস **লুব্রিক্যান্ট** (lubricant) রূপে কাজ করে ফলে মল নির্গমন সহজ হয়। মল বৃহদন্ত্রে প্রায় ৩৬ ঘন্টা অবস্থান করে। এ সময়ের ভিতর বস্তুগুলো ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ফলে বিভিন্ন সালফারঘটিত গ্যাসে (যেমন-হাইড্রোজেন সালফাইড) উৎপন্ন হয় এবং মল গন্ধযুক্ত হয়। মল মলাশয়ে প্রবেশ করলে মলাশয়ের প্রাচীরে যে চাপ সৃষ্টি হয় তা থেকে **ডেফিকেশন প্রতিবর্ত** (defecation reflex) ঘটে। ফলে কোলনে **পেরিস্ট্যালসিস** শুরু হয় এবং মলকে নিচের দিকে ঠেলে দেয়। উদর পেশি এবং ডায়াফ্রামের ঐচ্ছিক সংকোচনের ফলে পায়ুনালির ভিতরে স্ফিংটার পেশি শিথিল হয় এবং মল পায়ু পথে দেহে বাইরে চলে হয়ে আসে। পূনর্বয়স্ক মানুষ দিনে একবার কিংবা দুবার, আর শিশুরা বেশ কয়েকবার মলত্যাগ করে।

ব্যবহারিক অংশ

❑ যকৃতের অনুচ্ছেদ (Section through liver)

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. যকৃত কতকগুলো ক্ষুদ্র খন্ড বা **লোবিওল** (lobule)-এ বিভক্ত।
২. প্রত্যেক লোবিওল অসংখ্য বহুভূজাকার **যকৃত** বা **হেপাটিক কোষ** (hepatic cell)-এ গঠিত।
৩. কোষগুলো বহুভূজাকার ও এক/দ্বিনিউক্লিয়াসবিশিষ্ট।
৪. লোবিওলের মাঝে মাঝে **সাইনুসয়েড** (sinusoid) নামক ফাঁকা স্থান থাকে।
৫. প্রত্যেক লোবিওলের কেন্দ্রে একটি **কেন্দ্রীয় শিরা** অবস্থিত। কোষের মাঝে মাঝে রয়েছে কৈশিকনালি ও পিত্তনালি।

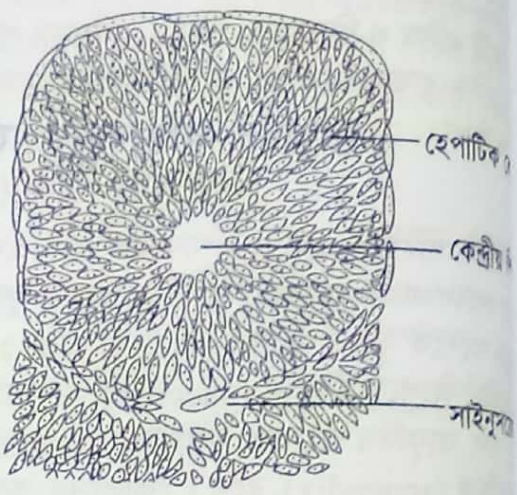

চিত্র ৩.১১ : যকৃতের অনুচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

❑ অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. নিঃস্রাবী কোষ দিয়ে গঠিত ও কেন্দ্রীয় গহ্বরযুক্ত লোবি বা **অ্যাসিনাস** উপস্থিত।
২. লোবিওলের ফাঁকে ফাঁকে **আইলেটস অব ল্যাঙ্গার** (islets of Langerhans) নামক কো বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত।
৩. কোষগুলোর মধ্যে রক্তনালি ও অগ্ন্যাশয় নালি আছে।
৪. অ্যাসিনাসগুলোর ফাঁকে ফাঁকে যোজক টিস্যু দেখা যা

চিত্র ৩.১২ : অগ্ন্যাশয়ের অনুচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

❑ পাকস্থলির প্রস্থচ্ছেদ

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. প্রাচীর পাঁচটি পর্যায়ক্রমিক স্তরে বিভক্ত, যথা–সেরোসা, পেশিস্তর, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা।
২. পেশিস্তর বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য ও অন্তঃস্থ বৃত্তাকার পেশিতে গঠিত। সাবমিউকোসা অ্যারিওলার যোজক টিস্যুতে নির্মিত এবং রক্তনালি, স্নায়ু প্রভৃতি ধারণ করে।
৩. মিউকোসা স্তর থেকে **বলী** (rugae) নামক কতকগুলো অভিক্ষেপ বের হয়েছে।
৪. মিউকোসায় **গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি** (gastric gland) দেখা যায়।

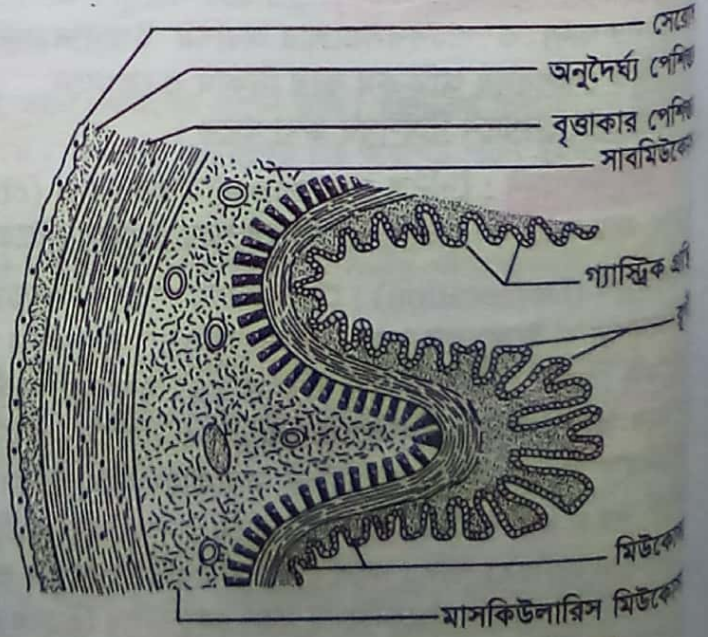

চিত্র ৩.১৩ : পাকস্থলির প্রস্থচ্ছেদ (অংশবিশেষ)

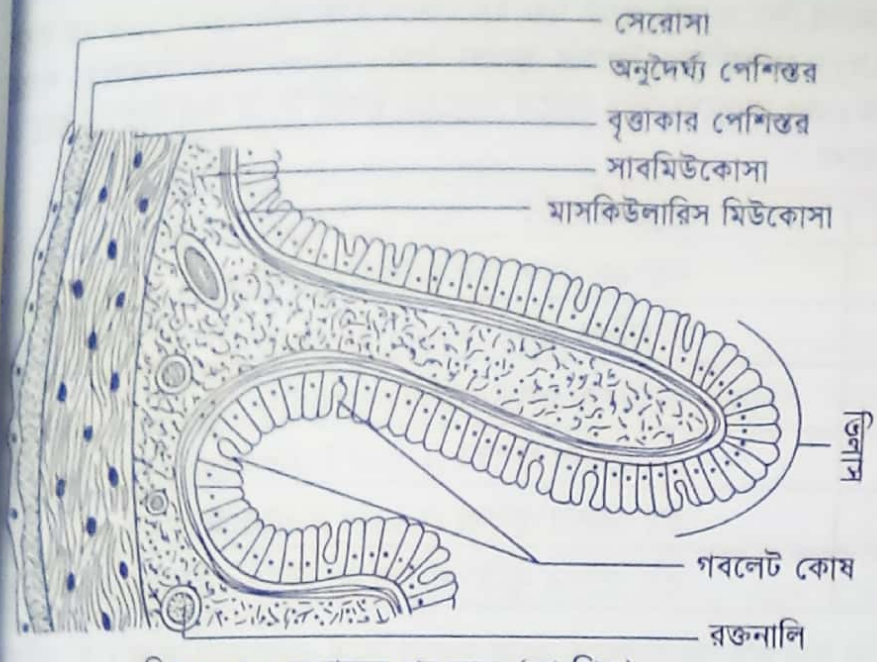

চিত্র ৩.১৪ : ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রস্থচ্ছেদ (আংশিক)

❑ **ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রস্থচ্ছেদ**

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য

১. সেরোসা, পেশিস্তর, সাবমিউকোসা, মাসকিউলারিস মিউকোসা ও মিউকোসা স্তর বিদ্যমান।

২. পেশিস্তর বহিঃস্থ অনুদৈর্ঘ্য ও অন্তঃস্থ বৃত্তাকার পেশিতে গঠিত।

৩. সাবমিউকোসা অ্যারিওলার যোজক টিস্যুতে নির্মিত এবং রক্তনালি ও স্নায়ু সমৃদ্ধ।

৪. মিউকোসা থেকে **ভিলাই** (villi) নামের আঙ্গুলের মতো কতগুলো অভিক্ষেপ বেরিয়েছে। মিউকোসাতে **গবলেট** ও **শোষণক্ষম** কোষ রয়েছে।

স্থূলতা (Obesity)

'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল'– একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় প্রবচন। আগে সাধারণ মানুষের চোখে স্বাস্থ্যবান মানুষ লতে দীর্ঘকায় ও মোটা-সোটা ব্যক্তিকে বোঝাত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে আমরা জানতে পেরেছি যে 'মোটা-সোটা' ক্তি মানেই স্বাস্থ্যবান মানুষ নয়। স্বাস্থ্যের আধুনিক সংজ্ঞা হচ্ছে : রোগ-ব্যাধি বা অন্যান্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতিমুক্ত রীরিক, মানসিক ও সামাজিক মঙ্গলকর অবস্থাকে **স্বাস্থ্য** বলে (Mosby's Medical Dictionary, 8th edition, 009)। এ সংজ্ঞা অনুযায়ী, স্থূলতাকে স্বাস্থ্যের পরিবর্তে অসুস্থতা হিসেবে বিবেচনা করে চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

আদর্শ দৈহিক ওজনের ২০% বা তারও বেশি পরিমাণ মেদ দেহে সঞ্চিত হলে তাকে স্থূলতা বলে। স্থূলতার ফলে দেহের ওজন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যায়। পূর্ণবয়স্ক মানুষে দেহের মাত্রাতিরিক্ত ওজন নির্ধারণের জন্য উচ্চতা ও ওজনের আনুপাতিক হার উপস্থাপন করা হয় তাকে **দেহের ওজন সূচক** বা **বডি মাস ইনডেক্স** (Body Mass Index = MI) বলে। BMI কে নিমরূপে প্রকাশ করা হয়।

$$BMI = \frac{\text{দেহের ওজন (কিলোগ্রাম)}}{\text{ব্যক্তির উচ্চতা (মিটার২)}}$$

একজন স্বাভাবিক মানুষের BMI - এর বিস্তৃতি হলো ২৫ - ২৯.৯ পর্যন্ত অর্থাৎ এই মান ৩০ বা তার চেয়ে বেশি তাকে **স্থূলকায়** বা **মোটা** বলা যাবে।

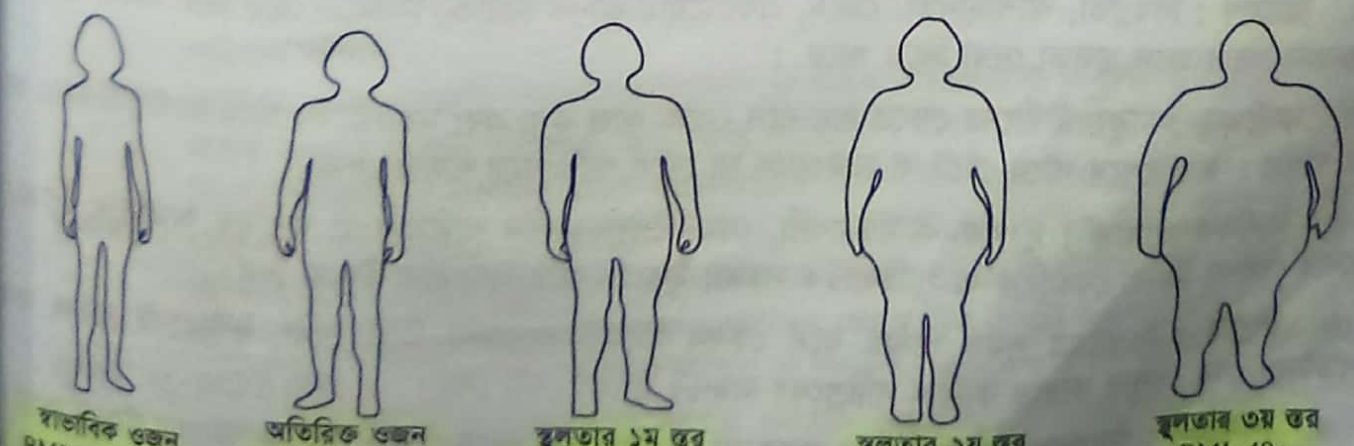

চিত্র ৩.১৫ : BMI নির্ণয়

পাশাপাশি এই মান ১৮.৫ এর নিচে হলে তাকে নিম্ন মাত্রার ওজন ধরা হয়। তবে মাত্রা যদি ৫০ - ১০০ হ এই স্থূলতাকে **মরবিড স্থূলতা** (morbid obesity) বা **ব্যধিগ্রস্থ বিভৎস স্থূলতা** বলে। ২০০০ সালে বিশ্বস্বাস্থ্য (WHO) BMI এই মান নির্দেশিকা প্রকাশ করে। এর সাহায্যে অতি সহজে মানুষের স্থূলতা নির্ণয় করা যায়। B এর মান নির্দেশিকাটি নিচের ছকে প্রকাশ করা হলো –

ক্রমিক	বিএমআই (BMI)	মানুষের শ্রেণি
১	<18.5 kg/m²	শরীরের ওজন কম (Under weight)
২	18.5 – 24.9 kg/m²	স্বাভাবিক ওজন (Normal weight)
৩	25.0 – 29.9 kg/m²	অতিরিক্ত ওজন (Over weight)
৪	30.0 – 34.9 kg/m²	১ম শ্রেণির স্থূলতা (Class I obesity)
৫	35.0 – 39.0 kg/m²	২য় শ্রেণির স্থূলতা (Class II obesity)
৬	≥ 40.0 kg/m²	৩য় শ্রেণির ঝুঁকিপূর্ণ স্থূলতা (Class III obesity

স্থূলতার ব্যাপকতায় সারা পৃথিবীর চিকিৎসা ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে আজ স্থূলতা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। এ চিকিৎসাবিজ্ঞানের একটি শাখাও সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের যে শাখায় স্থূলতার কারণ, প্রতিরোধ, চি অস্ত্রোপচার সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় তাকে **বেরিয়াট্রিকস** (Bariatrics) বলে। স্থূলতার কারণে যে সব রোগ হ তার মধ্যে রয়েছে–করোনারি হৃদরোগ, টাইপ–২ ডায়াবেটিস, ক্যান্সার (স্তন, কোলন), উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, পিত্তথলির অসুখ, স্লিপ অ্যাপনিয়া, অস্টিও-আর্থ্রাইটিস, বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি।

স্থূলতার কারণ (Causes of Obesity)

ব্যক্তি পর্যায়ে অতিরিক্ত ক্যালরি গ্রহণ, কিন্তু পর্যাপ্ত কায়িক পরিশ্রম না করাকে স্থূলতার প্রধান কারণ হিসে করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে, সামাজিক পর্যায়ে সুলভ ও মজাদার খাবার, গাড়ীর উপর নির্ভরতা বেড়ে যা উৎপাদন যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহারকে স্থূলতা বৃদ্ধির কারণ বলে মনে করা হয়। তবে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা যে সব স্থূলতার জন্য বিশেষভাবে দায়ী করেছেন তা নিচে উল্লেখ করা হলো।

১. **জিনগত :** সফল বিপাক এবং দেহে মেদ সঞ্চয় ও বিস্তারের ক্ষেত্রে **গুচ্ছ জিন** ভূমিকা পালন করে। বাবা-মায়ের সন্তান প্রায় ৮০ ভাগ ক্ষেত্রে স্থূলকায় হয়। নিম্ন বিপাক হার এবং জিনগত সংবেদনশীলতা স্থূলতা হয়ে দাঁড়ায়।

২. **পারিবারিক জীবনযাত্রা :** পরিবারের জীবনযাত্রার উপর স্থূলতা প্রকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। খা পারিবারিকভাবেই গড়ে উঠে। চর্বিযুক্ত ফাস্টফুড (বার্গার, পিৎজা ইত্যাদি) খাওয়া, ফল, সব্জি ও অপরি কার্বোহাইড্রেট (লাল চালের ভাত) না খাওয়া, অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় পান করা; দামী রেস্তোঁরায় খাওয়া ক্ষুধাবর্ধক ও খাওয়ার শেষে চর্বি ও চিনিযুক্ত ডেসার্ট (dessert) খাওয়া।

৩. **আবেগ :** বিষণ্নতা, আশাহীনতা, ক্রোধ, একঘেঁয়েমি-জনিত বিরক্তি, নিজেকে ছোট ভাবা কিংবা অ অতিভোজন করার ফলে স্থূলতা দেখা দিতে পারে ।

৪. **কর্মক্ষেত্র :** চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে ঠায় বসে থেকে কাজ করা এবং সহকর্মীদের চাপে ফাস্টফুড বা খাবার খাওয়া। কাজ শেষে পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে না চেপে গাড়ি করে বাসায় ফেরা।

৫. **মানসিক আঘাত :** দুঃখজনক ঘটনাবলী, যেমন-শৈশবকালীন শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার; প্রি হারানোর বেদনা; কিংবা বৈবাহিক বা পারিবারিক সমস্যা ইত্যাদি অতিভোজনকে উসকে দেয়।

৬. **বিশ্রাম :** বিশ্রামের সময় বাসায় বসে কেবল রিমোট-কন্ট্রোলড টিভি দেখা, ইন্টারনেট ব্রাউজ কম্পিউটারে গেম খেলার কারণে কায়িক পরিশ্রমের অভাবে স্থূলতা দেখা দেয়।

৭. **লিঙ্গভেদ :** গড়পরতায় নারীর চেয়ে পুরুষদেহে বেশি পেশি থাকে। পেশি যেহেতু অন্যান্য টিস্যুর চে ক্যালরি ব্যবহার করে (এমনকি বিশ্রামের সময়ও) পুরুষ তাই নারীর চেয়ে বেশি ক্যালরি ব্যবহার করে। এ কা পুরুষ একই পরিমাণ আহার করলেও নারীদেহে মেদ জমার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

৮. **গর্ভাবস্থা** : প্রতিবার গর্ভধারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নারীদেহে ৪-৬ পাউন্ড ওজন বেড়ে যায়।

৯. **নিদ্রাহীনতা** : রাতে ৬ ঘন্টার কম ঘুম হলে দেহে হরমোনজনিত পরিবর্তন ঘটে ক্ষুধাগ্রতা বেড়ে যায় ফলে বেশি পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করায় স্থূলতার সৃষ্টি হয়।

১০. **শিক্ষার অভাব** : সুস্বাস্থ্য সম্পর্কে ধারণা না থাকা, সুষম খাদ্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, স্থূলতার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে না জানা ইত্যাদি কারণে স্থূলতা দেখা দেয়।

১১. **অসুখ** : পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম (Polycystic Ovary Syndrome) হলে নারীদেহে স্থূলতা দেখা দিতে পারে। তা ছাড়া, কুসিং সিনড্রোম (Cushing's Syndrome), হাইপারথাইরয়েডিজম (Hyperthyroidism) হলেও স্থূলতা হতে পারে।

১২. **কতক ওষুধ** : কিছু ওষুধ স্থূলতার সম্ভাবনাকে উসকে দিতে পারে, যেমন–কার্টিকোস্টেরয়েডস, অবসন্ন দূর করার ওষুধ (অ্যান্টিডিপ্রেসেন্টস), জন্মবিরতিকরণ বড়ি প্রভৃতি। তাছাড়া ইনসুলিন ও কিছু ডায়াবেটিক প্রতিষেধক ওষুধও স্থূলতা সৃষ্টি করে।

স্থূলতা প্রতিরোধ (Prevention of Obesity)

স্থূলতাজনিত ঝুঁকির মধ্যে কেউ থাক বা না থাক সবারই এ বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত। স্থূলতা প্রতিরোধের জন্য নিচে উল্লেখিত আচরণ-কেন্দ্রিক বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ, পালন ও অনুসরণ করতে হবে।

১. **নিয়মিত ব্যায়াম** : সপ্তাহে অন্তত ১৫০–২৫০ মিনিট দ্রুত হাঁটা বা সাঁতার কাটার অভ্যাস করতে হবে।

২. **স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যগ্রহণ** : কম ক্যালোরি ও পুষ্টিসমৃদ্ধ ফল, সব্জি ও গোটা শস্য দানা গ্রহণ করতে হবে।

৩. **খাদ্য নিয়ন্ত্রণ** : চর্বিময় খাবার, মিষ্টিসমৃদ্ধ আহার গ্রহণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অ্যালকোহল গ্রহণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

৪. **লোভনীয় খাবার পরিহার** : লোভনীয় খাবারের দিকে হাত বাড়ানো ঠিক নয়। ভুক্তভোগীরা যেন আহার গ্রহণের সময় তাদের জন্য নির্ধারিত খাবার তালিকা কঠোরভাবে মেনে চলেন সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫. **দেহের ওজন নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা** : প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত অন্তত একবার নিজের ওজন মেপে দেখতে হবে রুটিন অনুযায়ী খাদ্য গ্রহণের প্রভাব কতখানি সফল হয়েছে। দীর্ঘমেয়াদী ফল পেতে হলে খাদ্য ও ব্যায়াম সংক্রান্ত তালিকার প্রতি অটল ও বিশ্বস্ত থাকতে হবে।

৬. **চিকিৎসা** : Orlistat (Xenical), Lorcaserin (Belviq), Phentermine (Suprenza) প্রভৃতি ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্থূলতা প্রতিকারে মানুষ আজ ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারেও পিছপা হচ্ছে না।

প্রধান শব্দভিত্তিক সারসংক্ষেপ

কাইম : পাকস্থলিতে খাদ্য প্রবেশের পর পাকস্থলির পেশির সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে খাদ্যদলা গ্যাস্ট্রিক গ্রন্থি নিঃসৃত গ্যাস্ট্রিক জুসের সাথে মিশে দলিত মথিত হয়ে নরম পিচ্ছিল খাদ্য পিণ্ডে পরিণত হয়। একে কাইম (chyme) বলে।

এপিগ্লটিস : মানুষসহ বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণীর জিহ্বার একেবারে গোড়ায় (গলবিলে) সংযুক্ত একটি ক্ষুদ্র নমনীয় অঙ্গবিশেষ। খাদ্যদ্রব্য গলাধঃকরণের সময় এটি শ্বাসরন্ধ্রকে (গ্লটিস) আবৃত করে শ্বাসনালিতে খাদ্য প্রবেশে বাধা দেয়। এপিগ্লটিস বা আলজিহ্বা স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি ও শ্লেষ্মাস্তর দিয়ে গঠিত।

লালা : মানুষের মুখের তিনজোড়া লালাগ্রন্থি থেকে নিঃসৃত একপ্রকার বর্ণহীন জলীয় দ্রবণের নাম লালা। লালায় অবস্থিত মিউসিন খাদ্যদ্রব্যকে নরম ও পিচ্ছিল্ল করে এবং টায়ালিন ও মল্টেজ এনজাইম শর্করা খাদ্যকে পরিপাক করে।

অগ্ন্যাশয় : অগ্ন্যাশয় একটি মিশ্রগ্রন্থি। অগ্ন্যাশয়ের লোবিওল নামক বহিঃক্ষরা বা সনালগ্রন্থি নিঃসৃত অগ্ন্যাশয় রসের নানা প্রকার এনজাইম খাদ্য পরিপাক করে এবং আইলেটস অব ল্যাঙ্গারহ্যান্স নামক অন্তঃক্ষরা বা অনালগ্রন্থি নিঃসৃত ইনসুলিন ও গ্লুকাগন নামক হরমোন রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

সিকাম : মেরুদন্ডী প্রাণীর ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত বদ্ধ থলির মতো স্ফীত অংশের নাম সিকাম। মাংসাশী প্রাণীর সিকাম ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। কিন্তু অধিকাংশ তৃণভোজী প্রাণীর ক্ষেত্রে এটি বেশ বড় ও সুগঠিত থাকে। এখানে সেলুলোজ পরিপাক হয়। মানুষের ক্ষেত্রে এটি একটি লুপ্তপ্রায় অঙ্গ।

স্থূলতা : দেহের ওজন অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার কারণে যে স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি হয় তাকেই স্থূলতা (obesity) বলে। এক্ষেত্রে চর্বি জমার কারণে দেহের উচ্চতার তুলনায় ওজন অনেক বেড়ে যায় যা বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায়।